সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

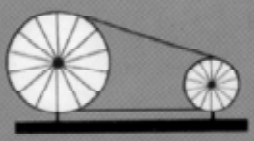

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
— দারুণ কাজ দেবে।

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

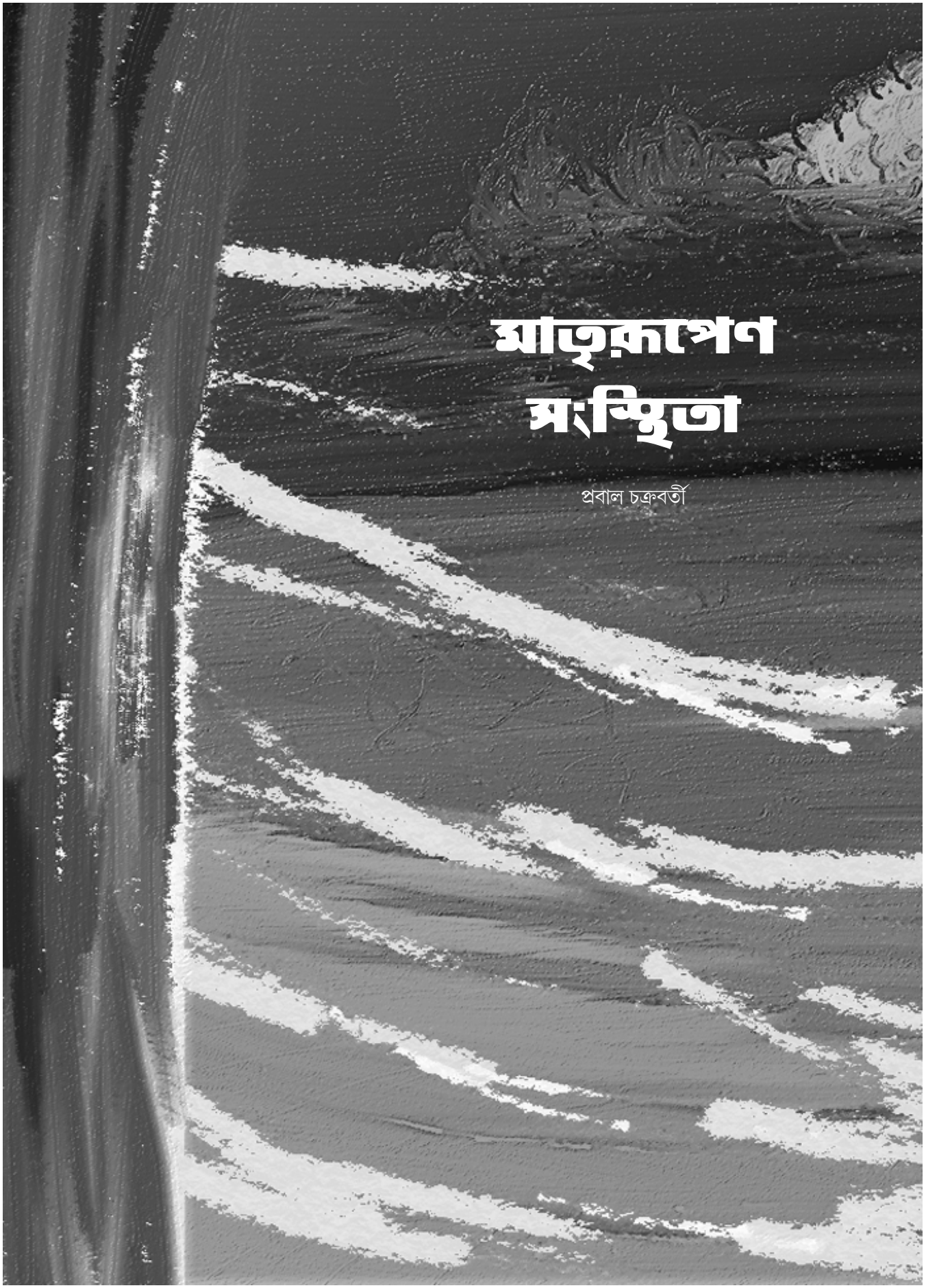

মাতৃরূপেণ সংস্থিতা

প্রবাল চক্রবর্তী

উপন্যাসোপম কাহিনি

হঠাৎ তূর্যনিনাদে কেঁপে উঠল প্রান্তর।

দূরে দিগন্তরেখায় আকাশছোঁয়া বরফ-ঢাকা পর্বতমালা, দু-হাত দিয়ে আগলে রেখেছে অভিরাম এক শ্যামল ভূভাগকে। তারই মাঝে অতিকায় এক হলুদ পাথরের বেদী। সৈন্যবাহিনী এগিয়ে চলেছে সেদিকে। সে বাহিনীর সবাই নারী। তাদের পায়ের তলায় চূর্ণ হচ্ছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দানব-সেনাদের মৃতদেহ। বাহিনীর নেতৃত্বে রক্তবস্ত্র পরিধান এক অসামান্যা তেজস্বিনী নারীযোদ্ধা, এক অতিকায় সিংহে আরোহিণী। তাঁকে ঘিরে রেখেছেন দশজন নারী-যোদ্ধা। তাঁরা কেউ বাঘ, কেউ সিংহ, কেউ বা নেকড়ের পিঠে আসীন। ঝোড়ো বাতাস বইছে শন্‌শন্‌ শব্দে। রাশি রাশি ধূলিকণা পাকসাট খেতে খেতে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে ব্যোমমার্গে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রাণপণে ডানা ঝাপটে এদিক ওদিক পালাচ্ছে। আসন্ন দুর্যোগের আশঙ্কায় হতভম্ব প্রকৃতি থরথর করে কাঁপছে। আকাশ ফাটিয়ে রুপোলি বিদ্যুতের তরবারি ধেয়ে গেল দিগন্তের এপার থেকে ওপারে। প্রাণপণ চেষ্টা করছে মহিষ, দৌড়ে পালাতে। পা অসাড়। শরীর অসাড়। ঝাপসা চোখে মহিষাসুর দেখল, দশদিক আলো করে সিংহবাহিনী নারীযোদ্ধার ত্রিশূল ধেয়ে আসছে তারই দিকে। মেরুদণ্ড বরাবর তীব্র এক হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল। জীবনে এই প্রথম প্রাণভয় জাগলো মহিষাসুরের মনে।

'মা! রক্ষা করো মা!!!'

ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসল মহিষ। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে। হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। যেদিন থেকে ব্রঙ্গায় এসেছে, সেদিন থেকে প্রায় রাতেই এই স্বপ্নটা ফিরে ফিরে আসে। তারপর আর ঘুম আসে না সারারাত। কে ওই নারী? কেন তাকে এত ভয়? সিংহবাহিনীর মুখখানা যেন ঠিক মাতামহী দনুর মতো।

বাঁ চোখের ওপরের গভীর কাটা দাগটার ওপর অন্যমনস্কভাবে হাত বোলালো মহিষ। গবাক্ষের বাইরে নিরন্ধ্র মেঘলা আকাশ। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে সেই সকালবেলা থেকে। এখনও থামার নাম নেই। বাতাসে ভিজে জঙ্গলের গন্ধ। পাঁকের গন্ধ। ভিজে জংলি পশুর বোঁটকা গন্ধ। দূর থেকে ভেসে এল হাড়-কাঁপানো একটা হুঙ্কার। ব্রঙ্গার বাঘ শিকার খুঁজছে। হঠাৎ ভীষণ গা গুলিয়ে উঠল মহিষের। ওই ঘন জঙ্গলের মাঝে, মাতলী নদীর ওই থক্‌থকে কালো কাদার নীচে পোঁতা আছে বহু রক্তপিপাসু রাজার দিগ্বিজয়ের নিষ্ফল স্বপ্ন। বড় অলক্ষণা এই ব্রঙ্গা।

একটি রাজ্য অধিকার করতে কতদিন সময় লাগে? বেশিদিন লাগে না, যদি সে রাজ্যের শাসক অযোগ্য হয়। আর যদি সে রাজ্যের প্রচারা ভাবে, কে রাজা হল তাতে কী আসে যায়, সব রাজাই তো সমান।

না, একটি রাজ্য অধিকার করতে বেশিদিন তো লাগে না। তা সে যত শক্তিশালী রাজ্যই হোক না কেন।

ঠিক ছ'মাস আগের কথা।

পাড় থেকে অনেক দূরে গভীর সমুদ্র। সেখান থেকেও পরিষ্কার দেখা যায়, ব্রঙ্গার সমুদ্রবন্দরের ব্যাপ্তি এতটাই। মাতলী নদীর মোহনায় সুন্দরী ও গরান গাছের ঘন জঙ্গল ফুঁড়ে যেন মন্ত্রবলে বেরিয়ে এসেছে এক মায়ানগরী। জড়ো হয়েছে অগণিত পালতোলা নৌকা। নিত্যনতুন নৌবহরের আনাগোনা, নাবিকদের উচ্চস্বরে গান হইচই, নৌকা-সারাইয়ের ঠুকঠাক ও মালবাহকদের তর্কাতর্কিতে মুখরিত এক অতিকায় বন্দর। ধূসর সন্ধ্যা নামছে ব্রঙ্গাসাগরে। বন্দর থেকে শতহস্ত পরিমাণ দূরত্বে পৌঁছনোমাত্র ছোট্টো নৌকাটি বাঁক নিল পশ্চিমদিকে। বাহুল্যবিহীন নৌকাটির আরোহী মাত্র দু'জন। একজন নারী, অন্যজন পুরুষ। উভয়েরই মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠনে ঢাকা। নৌকার হাল নারীটির হাতে, দাঁড়দুটি পুরুষটির। কিছুদূর পশ্চিমমুখী চলার পর বন্দরের কোলাহল স্তিমিত হয়ে এল। জঙ্গল এখানে নিবিড়। সঘন জটাজাল ভেদ করে শীর্ণ একটি নদী অনেক দ্বিধায় এসে মিশেছে সমুদ্রে। দুর্ভেদ্য লতাগুল্মর আড়ালে প্রায় অদৃশ্য তার মোহনা, নদীটির নাম মালঞ্চ। নৌকা এখানে এসে আবার অভিমুখ পরিবর্তন করে নদীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। নিমেষে সূচীভেদ্য আঁধার ঘনিয়ে এল। এখানে দিনের বেলাতেও সূর্যদেবের প্রবেশ নিষেধ, সন্ধ্যা তো কোন দূরস্থান। তিন হাত দূরে কী আছে, তাও ঠিক করে ঠাহর করা যায় না। বাতাসে পচা শ্যাওলার দুর্গন্ধ। অখণ্ড নীরবতা, পাখিও ডাকে না। অসংখ্য উর্ধ্বমূল বৃক্ষের গোলকধাঁধা পেরিয়ে অন্ধকার ঠেলে এগিয়ে চলল নৌকাটি। মাঝেমাঝেই নৌকা আটকে যায়, জঙ্গল কেটে পথ বানাতে হয়। ঠিক সেই সময় সরসর শব্দ করে কুমীর সাঁতার কেটে এগিয়ে যায় নৌকার পাশ কাটিয়ে। ক'ঘণ্টা এইভাবে চলার পর দূরে শোনা গেল মানুষের স্বর। শিশুদের

কলকাকলি, গৃহস্থালীর ঠুংঠাং। ভারী শকটের রাজপথ দিয়ে দৌড়ে চলার ঘর্ঘরধ্বনি। সেইদিকে আঙুল তুলে নৌকারোহী মহিলাটি বলল, 'এবার থামো। আমরা এসে গেছি।'

'হুঁ', এই বলে লোকটি মুখের কাপড় সরালো। খর্বাকৃতি বলিষ্ঠদেহী এক যুবক। ফর্সা রং। থুতনির নিচে চাপবাঁধা দাড়ি, চোখে ক্রূরতা ও শঠতার এক নৃশংস সংমিশ্রণ। দাঁড়ের সাহায্যে নৌকাটিকে ধীরে ধীরে তীর সংলগ্ন একটি সুন্দরী গাছের সন্নিকটে এনে ফেলল, বেঁধে ফেলল উর্ধমুখী একগাছি শিকড়ের সঙ্গে। এখান থেকে দিব্যি দেখা যায়, দূরে জঙ্গলে ঢাকা একটি গ্রাম। উল্কা জ্বলছে স্থানে স্থানে। আলোছায়ার অলৌকিক হিজিবিজিতে ভুতুড়ে দেখাচ্ছে গ্রামটিকে।

'শোনো রক্তবীজ', বলল মহিলাটি, 'যে পথ দিয়ে আমরা এলাম, ঠিক সেই পথ দিয়ে প্রতি রাতে পাঁচটি নৌকা বোঝাই করে তোমার লোকেদের এই গ্রামে নিয়ে আসবে। প্রতি রাতে পাঁচটি নৌকা, তার বেশি কোনোমতেই নয়। অন্যথায় ব্রঙ্গার নৌসেনা টের পেয়ে যাবে। গ্রামের অধিবাসীরা তোমার লোকেদের থাকা-খাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দেবে। তিন-চারমাস এইভাবে চালিয়ে যেতে হবে। তাহলেই...'

'এ গ্রামের লোকেরা বহিরাগতদের স্বাগত জানাবে কেন? বিশেষত আমরা যখন অসুর, আর এরা ব্রঙ্গাহৃদি।'

'এরা ব্রঙ্গাহৃদি নয়', বললেন মায়াবলী, 'ব্রঙ্গাসাগরের ওপারের কোনও এক দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে এরা এসেছিল এখানে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে। আমার পিতা তখন ছিলেন ব্রঙ্গার শাসক। তাঁকে অনুরোধ করে আমিই এদের এখানে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করে দিই। সেই থেকে এরা আমার বশংবদ। আমি যা বলব, এরা তাই শুনবে। হুঁঃ...' মনে মনে হেসে উঠলেন মায়াবলী, 'না আমার পিতা, না আমার ভ্রাতা— কেউই তখন খেয়াল করেনি, রাজ্যে এত জায়গা থাকতে এদের বসতির জন্য এই জায়গাটাই আমি কেন বেছে নিয়েছিলাম। এই স্থানটির একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বলো তো সেটি কী?'

'বৈশিষ্ট্য হল', বলল রক্তবীজ, 'গঙ্গানগরের মূল রাজপথ এই বসতির পাশ দিয়ে গেছে। সমুদ্রবন্দর ও গঙ্গানগরের মধ্যেকার একমাত্র যোগস্থল সে রাজপথ।'

'ঠিক তাই, 'বললেন মায়াবলী, 'এখানে কোনও বড়সড় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারলে গঙ্গানগর অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে। সেই সুযোগের সঠিক সদ্ব্যবহার করতে পারলে মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়েই রাজপ্রাসাদ জয় করা সম্ভব। তাই যেমন বললাম, সেইমতো কাজ শুরু করো। আজ রাত থেকেই। তোমার সাথে গ্রাম প্রধানের পরিচয়...'

'কী নাম এই গ্রামের?' প্রশ্ন করল রক্তবীজ।

'অলতু', বললেন মায়াবলী।

জঙ্গলের মাথা ছাড়িয়ে চাঁদ উঠল এইমাত্র। রুপালি নয়, হলদে চাঁদ। নোংরা, ভুতুড়ে তার আলো। অলতু। অদ্ভুত নাম তো! গা-ছমছম গ্রামটিকে একবার ভালো করে দু'চোখ ভরে দেখলো রক্তবীজ। শান্ত, নিস্তরঙ্গ, বৈশিষ্ট্যহীন একটি গ্রাম। ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নেবে এই গ্রামটি। পূর্ব ভারতে অসুর বিজয়কেতন এখানেই প্রথম উড়বে।

দিগন্তে রঙের আবির ছিটিয়ে সূর্যদেব সবে চিক্‌চক্রবালে উঁকি দিয়েছেন, এমন সময় দিগন্তের অন্ধকার ওপার থেকে হাঁসফাঁস শব্দ করতে করতে চলমান প্রেতের সারির মতো একদল মহিষ হাজির হল নদীখাতে। দীর্ঘ যাত্রাশেষে ধূলিমলিন তাদের বর্মাবৃত দেহ। পিঠে আসীন বর্মাচ্ছাদিত ভীমকায় যোদ্ধারাও সবাই শান্ত। মাথায় তাদের মহিষ-করোটির শিরস্ত্রাণ, তবু সগর্বে উঁচিয়ে রয়েছে, যেন প্রতিস্পর্ধায় আহ্বান করছে সূর্যদেবকে। সবার পিছনে ধীরগতিতে গড়িয়ে চলেছে একটা খালি খাঁচাগাড়ি, চারটে মহিষ টেনে নিয়ে চলেছে সেটাকে। সবাই একসঙ্গে থমকে দাঁড়ালো।

রাজপথ এখানেই শেষ হয়েছে।

একরাশ মানুষ-সমান উঁচু প্রস্তরখণ্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে এখানে সেখানে। তাদের ফাঁক দিয়ে সাদা নুড়িপাথর বিছানো আঁকাবাঁকা নদীখাত বেয়ে তিরতির বয়ে চলেছে স্বচ্ছ জলের ধারা। রাজপথ মিশে শেষ হয়েছে সেই নদীতেই। নদীর ওপারে সমতল জুড়ে যতদূর চোখ চায় ঢেউখেলানো বনানী। ঘন বন নয়। এই পাথুরে জমিতে মহীরুহ জন্মায় না। ঝোপঝাড় লতাগুল্ম একত্রিত হয়ে কাননের রূপ পরিগ্রহ করেছে। সে কাননের আনাচে-কানাচে বাজরার খেত। ভোরের সোঁদা বাতাসে পাকা ফসলের সুগন্ধ।

ধীর সন্তর্পণে নদী পেরোলো মহিষসেনা। বাজরার খেত মাড়িয়ে জঙ্গল ভেদ করে এগিয়ে চলল গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। এক প্রহর পথ চলার পর দেখা গেল, সমতলভূমি ধাপে ধাপে গড়িয়ে উঠেছে উঁচু পাথুরে পাহাড়ে। সেই পাহাড়কে বেড় দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা এক তটিনী। শীর্ণকায় সেতু এপারের সঙ্গে ওপারের সংযোগ রক্ষা করেছে। ওপারে পায়ে চলা পাকদণ্ডী পাহাড়টাকে বেড় দিয়ে গেছে পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত।

সেখানেই পাহাড়ের চাঁদির ওপরে জড়ো হয়েছে শ'খানেক কুটির। জংলি লতাগুল্ম দিয়ে তৈরি তাদের শরীর, লতাগুল্ম দিয়ে ছওয়া মাথা। পাহাড়ের কোলে আয়েশে গা এলিয়ে রয়েছে ছোট্ট শান্ত পাহাড়ি গ্রাম। সেতু পার হয়ে মহিষ-বাহিনী সেদিকেই এগিয়ে চলল।

গ্রামের পাঠশালায় এখন পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীরা একে একে শিক্ষকের সামনে এসে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল, এমন সময় পাঠশালার বাইরে শোনা গেল মহিষ-বাহিনীর খুরের শব্দ। সঙ্গে একাধিক অচেনা কণ্ঠের হুঙ্কার।

'ও-ওটা কী গুরুমশাই?' ভয়ে কেঁপে উঠলো ছাত্র-ছাত্রীরা।

'আমি দেখছি। তোমরা কেউ কিন্তু বাইরে বেরিও না না।' বলে শিক্ষক বেরিয়ে এলেন পাঠশালা থেকে। বেরিয়েই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। পাঠশালা ঘিরে ধরেছে একদল মহিষ-সৈন্য। প্রতিবাদ করার আগেই শিক্ষককে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল সৈন্যরা। তুলে দিল খাঁচাগাড়িতে। একদল সৈন্য ধেয়ে এল পাঠশালার ভেতরে। শিক্ষার্থীদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে তুলতে লাগলে সেই খাঁচাগাড়িতে। ইতিমধ্যে গোলমাল শুনে গ্রামের লোকেরা জড়ো হয়েছে পাঠশালার আশপাশে। নিজেদের সন্তানদের খাঁচাগাড়িতে বন্দি দেখে আর্তনাদ করে উঠল তারা। মারমুখী হয়ে খাঁচাগাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কয়েকজন।

'গ্রামবাসীরা', চিৎকার করে বলল সৈন্যদের দলপতি, 'তোমরা নিশ্চয়ই অবগত আছো, সম্রাট তার সেবার জন্য সাম্রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম থেকে প্রতিবছর পাঁচটি বালক ও পাঁচটি বালিকাকে রাজপ্রাসাদে পাঠাতে বলেছেন। তোমরা সে আদেশ এখনও পালন করোনি। সম্রাট মহিষাসুর দয়াবান, তাই তোমাদের কোনওরূপ শাস্তি দেননি। কিন্তু তাঁর প্রাপ্য তো তাঁকে দিতেই হবে। তাই আজ আমরা তোমাদের গ্রাম থেকে সম্রাটের প্রাপ্য ও ক্ষতিপূরণ বাবদ কুড়িটি বালক-বালিকাকে নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করো না, তাহলে ফল ভয়ঙ্কর হবে।'

সন্তানদের আসন্ন ভবিষ্যতের কথা ভেবে শিউরে উঠল গ্রামবাসীরা। যে যা পেল হাতের কাছে, তাই নিয়ে আক্রমণ করল মহিষাসুরের সৈন্যদের। মহিষ-দলপতি নির্দেশ দিল, 'আক্রমণ'। দেখতে দেখতে বাতাসে ঝড় তুলে দৌড়ে এল মহিষ-যুথ, নিমেষে পিষে ফেলল গ্রামবাসীদের। অসম এই যুদ্ধের পরিণতি নিয়ে সংশয় থাকার কথা নয় কারোর। কিন্তু তাতে কী আসে যায়! বুকের সন্তানকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে নরপিশাচরা, এটা দেখার পর কোন বাবা-মা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে? দলে দলে গ্রামবাসী দৌড়ে এল চারিদিক থেকে। তাদের লাশের পাহাড় জমে উঠল পাঠশালার সামনে। রক্তের দুর্গন্ধ মিশে গেল ভোরের পবিত্র বাতাসে।

আড়াল থেকে সবই দেখল মেয়েটি।

ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা গ্রামবাসীদের মৃতদেহগুলিকে মাড়িয়ে মহিষ-যুথ এগিয়ে চলল ফেরার পথে। খাঁচাগাড়ি ভর্তি শিকার নিয়ে। পাকদণ্ডী বেয়ে অর্ধ প্রহরকালের মধ্যেই পৌঁছে গেল সেতুর সামনে। এমন সময় দলপতি দেখল, সেতুর অন্য পারে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক কিশোরী। গাত্রবর্ণ রক্তাভ, এলোচুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। পরনে ধূলিমলিন ছিন্নভিন্ন বসন। অস্বাভাবিক রকমের রুগ্ন ও লম্বা মেয়েটি। জলভরা চোখদুটোয় দাবানলের আগুন জ্বলছে। 'সাবধান।' হুঙ্কারের সঙ্গে বলল সে, 'সেতু পার হওয়ার চেষ্টা করেছো কী মরেছো।'

'কে রে তুই, আমাদের সাবধান করছিস?' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেঁকে বলল দলপতি, 'হাতি ঘোড়া গেল তল, এখন ব্যাঙ বলে কত জল! অ্যাই, মেয়েটাকে ধর তো।' এই বলে বাহন মোষটিকে ছুটিয়ে দিল সেতুর ওপর, পেছনে বাকি সৈন্য।

নিশ্চল দেহে দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটি। কয়েক মুহূর্ত পার হয়ে গেল। মহিষ-দলপতি কাছেই এসে পড়েছে। মেয়েটি তবু স্থির দৃষ্টিতে প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ব্যাপারটা কী? দলপতির মনটা হঠাৎ খুঁতখুঁত করে উঠল। পেছন ফিরে দেখল, সৈন্যরা সবাই সেতুর ওপরে উঠে পড়েছে। খাঁচাগাড়িটা যেহেতু সবার পেছনে ছিল, সেটা এখনও রয়েছে সেতুর অন্য পারে, মাটির ওপর। দলপতি ঘাড় ফিরিয়ে সামনে দেখল, দীর্ঘদেহিনী সেই কিশোরী তার শীর্ণ হাত মাথার ওপরে তুলেছে। হাতে দীর্ঘকায় এক খড়্গ। মুহূর্তে দলপতির কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, কী ঘটতে চলেছে। ক্ষীপ্রগতিতে নিজের তরবারি কোষমুক্ত করে নিভুল লক্ষ্যে ছুঁড়ে দিল মেয়েটির দিকে। সেই মুহূর্তেই খড়্গের ভয়ঙ্করী আঘাতে সেতুর রুজ্জবন্ধনী ছিন্নভিন্ন করে দিল মেয়েটি। মড়মড় করে সেতু হেলে পড়ল একধারে। দেখতে দেখতে মহিষের দল আরোহীশুদ্ধ গড়িয়ে পড়ল নদীতে। খরস্রোতা পাহাড়ি নদী ধুয়ে নিয়ে গেল তাদের। শুধুমাত্র বন্দিভর্তি খাঁচাগাড়িটাই রয়ে গেল ওপারে। অরক্ষিত।

দলপতির তরবারি মেয়েটির গলা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে, গভীর এক ক্ষত রেখে গেছে। সেই ক্ষতস্থান হাত দিয়ে চেপে ধরে মেয়েটি হাঁটতে শুরু করল। গ্রাম যেদিকে তার ঠিক উল্টোদিকে। মহিষের সঙ্গে শত্রুতা করে নাকি কেউ বেঁচে থাকে না। বাঁচার একটাই উপায়, পালাতে হবে। আঙুলের ফাঁক গড়িয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে, সে রক্তে ভিজে যাচ্ছে জামা। তবু

মেয়েটির চলা থামলো না। পালাতে হবে। অনেক অনেক দূরে।

সেদিন থেকেই ছিন্নমস্তা গ্রামছাড়া।

মন্ত্রণাগৃহের আসন ছেড়ে উঠতে যাবেন, এমন সময় প্রতিহারী এসে সংবাদ দিল, গুপ্তচর-প্রধান বিরুপাক্ষ এসেছে। বিরক্ত হয়ে মহারাজ অমিতবল প্রহর-প্রদীপটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। আলোকশিখা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তার মানে, প্রহর শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই। সে এসে পড়বে... এসময় বিরুপাক্ষ কেন এসেছে বিরক্ত করতে? ইচ্ছে করছিল, লোকটাকে তাড়িয়ে দিতে। কিন্তু ব্রঙ্গরাজ্যের প্রাচীন পরম্পরা, গুপ্তচর-প্রধান যদি রাজার সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়, তবে তাকে ফেরানো যায় না। তা সে দিবা বা রাত্রির যে কোনও সময়েই হোক না কেন। তার ওপর এই লোকটা পিতার সময় থেকেই গুপ্তচর বিভাগের সর্বেসর্বা। বাধ্য হয়েই মহারাজ অনুমতি দিলেন।

'প্রণাম মহারাজ!' বিরুপাক্ষ করজোড়ে রাজার সামনে এসে দাঁড়াল।

'কী বলতে চাও, তাড়াতাড়ি বল।' বিরুপাক্ষের সৌজেন্যের উত্তর না দিয়েই বললেন রাজা।

'মহারাজ, সমস্যাটা অলতু নিয়ে।'

'কী হয়েছে সেখানে? নতুন কী সমস্যা?'

'সমস্যাটা ঠিক সেখানে নয়', বলল বিরুপাক্ষ, 'সমস্যা তার নিকটবর্তী বনানীকে নিয়ে। আপনার নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, গত মাসে আপনি রাজকীয় অধ্যাদেশ জারি করেছেন, মালঞ্চ নদীর মোহনা পর্যন্ত যাবতীয় বনানী পরিষ্কার করে সেখানে সমুদ্রবন্দর বিস্তারের কাজ শুরু করতে হবে।'

'হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই। বন্দরে বড্ড ভিড় হচ্ছে, সময়মতো জাহাজগুলোর শুল্ক আদায় হচ্ছে না। মেরামতির কাজ দিনের পর দিন পড়ে থাকছে। বন্দর বিস্তার না করতে পারলে বহু বণিক অন্য বন্দরে চলে যাবার কথা বিবেচনা করবে। অনেক টাকার ক্ষতি হয়ে যাবে তাতে।'

'ঠিক মহারাজ। কিন্তু সমস্যা হল, ওই বনানীর মধ্যে বহু জায়গায় অলতুবাসীরা চাষবাস ও পশুচারণ করে। জমি ছেড়ে দিতে হবে শুনে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। তারা ঠিক করেছে, রাজপথ অবরোধ করবে।'

'করলে করবে। তখন তাদের লাঠিপেটা করে হটিয়ে দিলেই চলবে।'

'সেখানেও একটা সমস্যা রয়েছে। আমার কাছে গুপ্ত সংবাদ এসেছে, রাজভগিনী মায়াবলী সেই অবরোধের নেতৃত্ব দেবেন। সৈন্যরা কি রাজভগিনীর ওপর বলপ্রয়োগ করতে রাজি হবে? আরেকটি ব্যাপার আমার সন্দেহের উদ্রেক করছে। শুনেছি, সম্প্রতি অলতুবাসীরা সবাই অসুধর্ম গ্রহণ করেছে। গ্রামের কেন্দ্রে যে মাতৃমন্দিরটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা আপনার পিতার হাত দিয়ে হয়েছিল, সেটিকে অপবিত্র ও ভূলুণ্ঠিত করেছে গ্রামবাসীরা।'

'বটে! তাদের এতবড় স্পর্ধা!' উত্তেজিত হয়ে উঠতে গিয়েও দমে গেলেন রাজা। নজর পড়ল প্রহর-প্রদীপটির দিকে। এইমাত্র নিভে গেল সেটি। প্রতিহারী এসে নতুন একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। অর্থাৎ, রাতের প্রথম প্রহর শুরু হল। সে মায়াবিনী হিরণ্যকেশী নিশ্চয়ই এসে পড়েছে। আমার প্রতীক্ষায় সে বসে আছে। ওহ, বড্ড সময় নষ্ট করে এই বিরুপাক্ষ।

'তাতে কী হয়েছে।' বললেন রাজা, কণ্ঠস্বরে বিরক্তির ভাব স্পষ্ট। সেই বিরক্তিকে অগ্রাহ্য করেই বিরূপাক্ষ বলল, 'মহারাজ, আমি বহুদিন ধরে অসুরদের সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করছি। দেখছি, সারা জম্বুদ্বীপ জুড়েই এরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। আর তার মূলে রয়েছে এদের বিশেষ ধরনের কার্যপদ্ধতি, যার মোদ্দা কথা হল, জনসংখ্যার বিস্তার। নারী, ভূমি ও নেতৃত্ব— এই তিনটি এদের লক্ষ্য। নারীদের এরা মানুষ নয়, বর্ধিত হারে প্রজননের উপায়মাত্র বলে মনে করে। আর সেই প্রজননের মাধ্যমে এরা একের পর এক ভূমি অধিকার করে। এরপর সেই ভূমির অধিকারের মাধ্যমেই এরা সমাজের নেতৃত্ব জবরদখল করে। কোনও রাজ্যে এদের সংখ্যা যখন রাজ্যের মোট জনসংখ্যার দশ শতাংশের কম থাকে, তখন এরা বলে, আমি একজন অসুবাদী, তাই বলে আমি সন্ত্রাসী নই। আমি রাজ্যের শত্রু নই। আমিও একজন মনুসন্তান, একজন মানুষ। আমি শুধু সম্মানের সঙ্গে শান্তিতে বাঁচতে চাই। চাই ন্যূনতম নাগরিক অধিকারটুকু, আর কিছু চাই না। আমার অসুবাদ শান্তির মতবাদ, আমি শুধু শান্তি চাই। এই বলে সকলের অগোচরে এরা নিজেদের জনসংখ্যা বাড়িয়ে চলে। অনুপ্রবেশ, ধর্মান্তর, বর্ধিত হারে প্রজনন— নানান পদ্ধতিতে। এই করতে করতে যেই এদের জনসংখ্যা কুড়ি শতাংশে পৌঁছায়, এদের হাবভাব যায় বদলে। এরা তখন বেশ রোয়াবের সঙ্গে বলে, এ রাজ্যটা কারোর একার নয়। আমরা কারোর দয়ায় এখানে নেই। এখানে অসুরদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। অসুবাদ শান্তির মতবাদ। কিন্তু আমাদের স্বতন্ত্র উপাসনা-পদ্ধতি অনুসরণের জন্য আমাদের

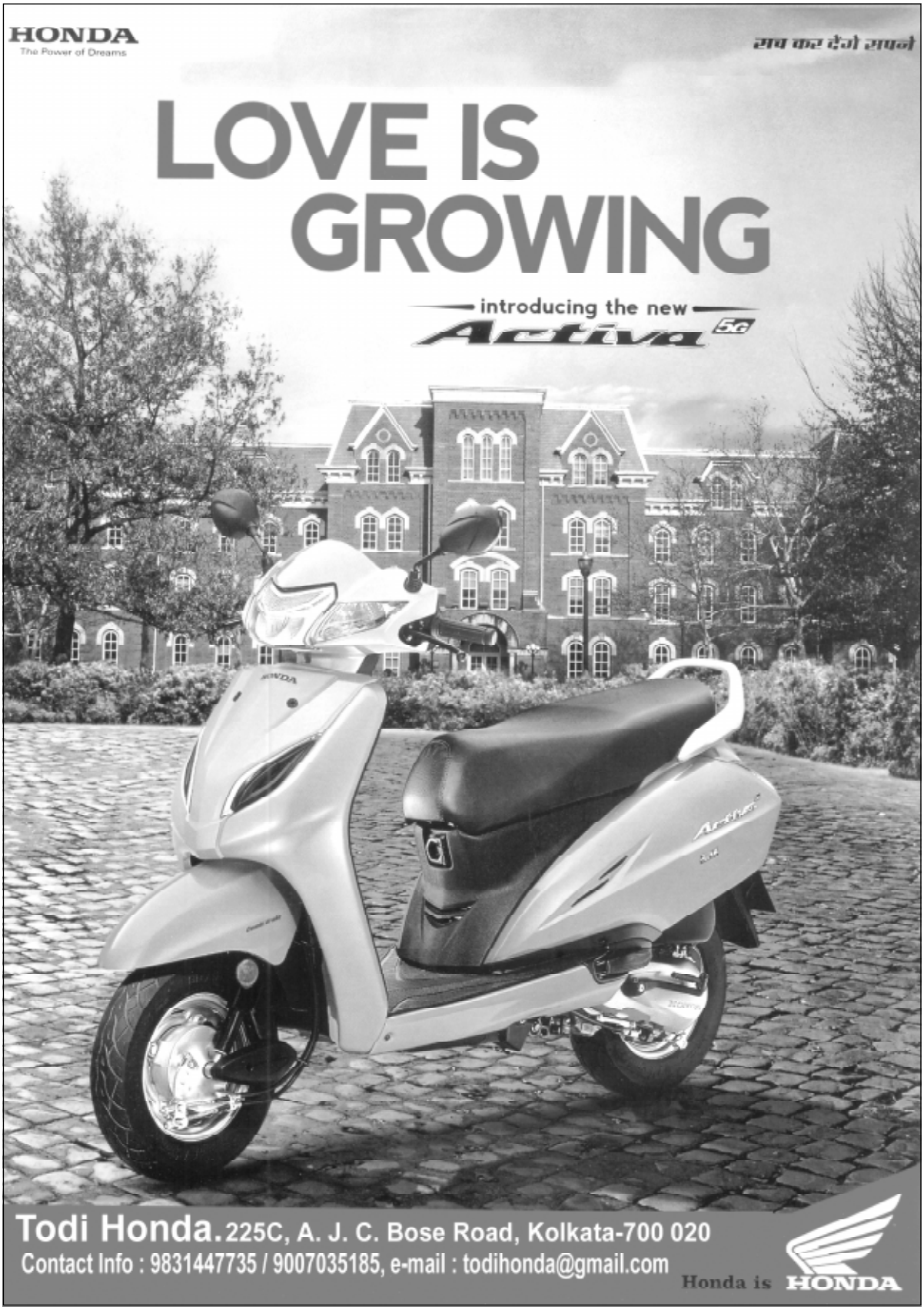
HONDA
The Power of Dreams
सब कर देंगे सपने
LOVE IS GROWING
introducing the new
Activa 5G
Todi Honda. 225C, A. J. C. Bose Road, Kolkata-700 020
Contact Info : 9831447735 / 9007035185, e-mail : todihonda@gmail.com
Honda is HONDA

অমুক অধিকার চাই। তমুক অধিকার চাই। এটা চাই, ওটা চাই। না দিলেই মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু করে দেয় এরা। এদের উৎপাতে বিরক্তিতে বা ভয়ে অন্য মতাবলম্বীরা সেই রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে শুরু করে। অসুরদের সংখ্যার অনুপাত আরও বাড়তে থাকে তাতে। এবার যখন এদের জনসংখ্যা রাজ্যের জনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশ ছাড়ায়, তখন শুরু হয় মূল বিপদ। তখন এরা বলে, এই রাজ্যটা শুধুমাত্র অসুরদের। পুরোটা রাজ্যই। এখানে অন্য কাউকে থাকতে দেবো না। কারণ, অন্যদের অপবিত্র পূজা-অর্চনা আমাদের পবিত্র পূজাপদ্ধতিকে কলুষিত করে দিচ্ছে। বাকিরা সবাই অন্য রাজ্যে চলে যাক না কেন? আমরা তো কারোর সঙ্গে অশান্তি করতে চাই না। কারণ, আমাদের অসুবাদ শান্তির মতবাদ। এইসময় শুরু হয় অন্য পন্থাবলম্বীদের বলপূর্বক বিতাড়ন। এর ফলে আরও দ্রুত এদের জনসংখ্যার অনুপাত বাড়তে থাকে। তারপর যেই এদের জনসংখ্যা আশি শতাংশ ছাড়ায়, এরা বলে, এ রাজ্য অসুরদের পবিত্রভূমি। বিধর্মীরা এরাজ্যের পরিবেশকে কলুষিত করে দিচ্ছে। যারা অসুর নয়, তারাই আমাদের শত্রু। চলো, এদের হত্যা করি। ব্যাস, শুরু হয় গণহত্যা। যে অসুবাদী নয়, তাকেই সপরিবারে কচুকাটা করা হয়। তা সে শিশুই হোক বা বৃদ্ধ। এতেই শেষ নয় মহারাজ। এরপর সে রাজ্যে যখন আর কোনও অন্য পন্থাবলম্বী বাকি থাকে না, তখন এরা নিজেদের মধ্যেই হানাহানি শুরু করে। এখন যেটা শুরু হয়েছে জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে, দিতি ও দনুর সন্তানদের মধ্যে। সবই শান্তির মতবাদ অসুবাদের নাম করে। আমার কথা শুনুন মহারাজ। যখনই দেখবেন রাজ্যের কোনও অংশে অসুবাদীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, জানবেন সেটা অশনি সংকেত। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা না নিলে রাজ্যটাই আর থাকবে না।'

'তার মানে তুমি বলতে চাও, সব অসুররাই খারাপ? এই যে দ্বারব্রহ্মায় আমাদের এত অসুর নাগরিক রয়েছে, সবাই খারাপ?'

'আমি তা বলিনি মহারাজ। ব্যক্তিগতভাবে একজন অসুবাদী ভালো হতেই পারে। কিন্তু তারা একজোট হলে অনিষ্টই শুধু করে। তাদের সামুহিক সত্ত্বা শুধু একটি পথেই ক্রিয়াশীল, আর তা হল...'

'তোমার ভাষণ শেষ হয়েছে?' হুঙ্কার দিলেন মহারাজ অমিতবল, 'কে কার আরাধনা করল, তাতে রাজার কী আসে যায়? এসব গোঁড়ামি ছাড়ো বিরুপাক্ষ, নাহলে তোমার চাকরি চলে যাবে।' এই বলে রূঢ় পদক্ষেপে মন্ত্রণাগৃহ ছেড়ে চলে গেলেন রাজা। অসহায়, কিংকর্তব্যবিমূঢ় বিরুপাক্ষ পড়ে রইল পিছনে। কিছুক্ষণ স্থানুর মতো বসে রইল সে। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে কক্ষত্যাগ করল। যার বিয়ে তার হুঁশ নেই, আমি একা ভেবে কী করব? মরুক গে যাক সব!

গ্রাম ছাড়ার পর বেশ ক'টা মাস পার হয়ে গেছে। চুলে জট পাকিয়ে জটা হয়েছে। একবারও তা পরিষ্কার করার চিন্তা মাথায় আসেনি। বনৌষধির প্রলেপ রক্তপাত বন্ধ করেছে। গভীর ক্ষত তবু রয়ে গেছে। ক্ষুধার তাড়নায় জঙ্গলে পশু শিকার করেছে, দিনের পর দিন কাঁচা মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছে। জঙ্গলের মাঝেমাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ। গত ক'মাসে অনেক জনপদ দেখেছে ছিন্নমস্তা। সবখানেই মহিষাসুরের সৈন্যদের দেখা মিলেছে। অমনি সে জনপদ ছেড়ে পালাতে হয়েছে। গোটা উত্তরাপথে কী এমন কোনও জনপদ নেই, যেখানে মহিষাসুরের শাসন এখনও শুরু হয়নি?

জঙ্গলের এলাকা শেষ হয়ে শুরু হয়েছে মালভূমি। গত দু'দিন তাই শিকার জোটেনি। অভুক্ত শরীর আর হাঁটতে পারে না। মালভূমির প্রান্তে এই জনপদটির দেখা পেয়ে একপ্রকার মরিয়া হয়েই ঢুকে পড়েছিল ও। জনপদের কেন্দ্রে নয়নাভিরাম চন্দ্রমন্দির, তারই সামনে বসে ছিল, যদি কিছু প্রসাদ জোটে। কোথায় কী! জনপদের নাগরিকরা দলে দলে আসছে, দেবতাকে উপঢৌকন চড়িয়ে চলে যাচ্ছে। সে উপঢৌকনের কণামাত্রও বাইরে বসে থাকা অভুক্ত ভিখারিদের কাছে আসে না। মরিয়া হয়ে ঠিক করল, মন্দিরে আসা-যাওয়ার পথে কোনও ভক্তকে লুঠ করবে।

মন্দিরের পাশেই একটি সরু গলি রয়েছে। তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে খড়্গ হাতে প্রতীক্ষা করছিল শিকারের। না, কোনও অশক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বা শিশুর ওপর হাত ওঠাতে পারবে না। এমন কাউকে আক্রমণ করতে হবে, যার প্রতি-আক্রমণের ক্ষমতা রয়েছে। অর্ধপ্রহর প্রতীক্ষার পর দেখল, এক বলিষ্ঠ যোদ্ধা। মন্দ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে মন্দিরের দিকে। কোমরবন্ধে তরবারি, দু'হাত ভর্তি ফলমূল মিষ্টান্নভরা রেকাবি। এক পা পিছিয়ে একটু ঝুঁকে দাঁড়ালো ও। শরীর টানটান, শিকারোদ্যত বাঘের মতো। যেই না লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে, অমনি কে যেন পেছন থেকে টেনে ধরল ওকে, এক ঝটকায় অনায়াসে ঘাড়ে তুলে নিল। উত্তেজনায় অবসাদে মাথা ঝিমঝিম করে উঠল, চোখে অন্ধকার দেখল ছিন্নমস্তা।

জ্ঞান ফিরল এক জলাশয়ের ধারে। দেখল, ওর চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে একটি মেয়ে। শ্যামলা ছোটখাটো মেয়েটি, নোংরা জামাকাপড়। গা-ময় শ্যাওলা। কটিদেশে খর্বাকৃতি অদ্ভুতদর্শন তরবারি, সাথে জড়ানো একরাশ দড়িদড়া। ফাঁস নাকি? দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। শুনেছিল, এই অঞ্চলের দস্যুরা এরকম ফাঁস ব্যবহার করে পথচারীদের আক্রমণ করে সর্বস্ব হরণ করে। এই মেয়েটিরও সেরকমই উদ্দেশ্য নাকি?

নিতান্তই সাধারণ দেখতে। নাঃ। এ ডাকাত হতে পারে না। কিন্তু এই ছোটখাটো মেয়েটির এত গায়ের জোর, যে ওকে ঘাড়ে তুলে এতদূর নিয়ে এসেছে? ছিন্নমস্তাকে চোখ খুলতে দেখে ওর দিকে একটা পিতলের ঘটি এগিয়ে দিল মেয়েটি। ধড়মড়িয়ে উঠে বসার চেষ্টা করল ছিন্নমস্তা, ওকে জোর করে শুইয়ে দিল। মুখের কাছে ঘটিটা এগিয়ে দিল আবার।

'এই দুধটুকু খেয়ে নাও বোন, গায়ে জোর পাবে।'

'কে তুমি?' বলল ছিন্নমস্তা।

'নাম আমার মাতঙ্গী। ভয় নেই, তোমার কোনও অনিষ্ট আমি করব না। দুধটুকু খাও, তারপর বলো তো, তোমার গল্পটা কী? গলায় এমন গভীর ক্ষত, চট করে দেখে মনে হয়, কবন্ধর ওপর কেউ যেন কাটামুণ্ডু বসিয়ে দিয়েছে। কে তোমার এই দশা করেছে? এ শহরের বাসিন্দা তো তুমি নও। কোত্থেকে এসেছো? মন্দিরের ভক্তর ওপর চড়াও হয়েছিলে কেন?'

ধীরে ধীরে সব বলল ছিন্নমস্তা। একেবারে শুরু থেকে। শুনে দুঃখের হাসি হাসলো মাতঙ্গী।

'তুমি কি কখনও কোনও অসু-মন্দিরে ঢুকছো?' বলল মাতঙ্গী।

'না, কেন?'

'অসুর-মন্দিরে দক্ষিণা নেওয়ার রীতি নেই। আমাদের মন্দিরগুলো কিন্তু দক্ষিণা নেয়। শুধু তাই নয়, দক্ষিণার মূল্যের ওপর ঠিক হয়, কে আগে দেবতার দর্শন পাবে, আর কে পরে। গরিব সহায়-সম্বলহীন অসুররা দুপুরের গরমে ও শীতের রাতে অসু-মন্দিরে আশ্রয় পায়। খেতে পায়। আমাদের মন্দিরগুলো গরিবদেব দেখলে দূরদূর করে তাড়িয়ে দেয়। তারা শুধু হাত পেতে নিতেই আছে, হাত উপুড় করে না কখনও।'

'হুঁ, ভালোই বলছো', বলল ছিন্নমস্তা, 'ভিক্ষাবৃত্তিটাকে বৈরাগ্য থেকে বিযুক্ত করে ব্যবসায়ের পর্যায়ে টেনে নামিয়েছে এই অসুররা। আর অসু-মন্দিরে গরিবদের আশ্রয়দান? উদ্দেশ্য ওদের শুধু গরিব মানুষদের মগজধোলাই। দুঃস্থ-দুঃখীদের দু-মুঠো অন্ন ও একটু আশ্রয় দিয়ে ওরা তাদের ইহকাল পরকাল, এমনকি পরিবার সন্তান-সন্ততিদেরও কিনে নিচ্ছে। পাশবিক কাজকর্ম করাছে তাদের দিয়ে। সেটাকে তুমি ভালো বলছ? ছিঃ!'

'আমাকে ভুল বুঝো না বোন,' বলল মাতঙ্গী, 'আমি শুধু আমাদের দুর্বলতাটা দেখাচ্ছি। যে উদ্দেশ্যেই অসুররা এটা করুক না কেন, এর ফলে গরিব অসুররা ভাবে, বিপদে অসু তাদের পাশে দাঁড়াবে। আমরা সেটা ভাবতে পারি না। গত তিন বছর ধরে অনাবৃষ্টি চলছে এই অঞ্চলে। কৃষকরা আত্মহত্যা করছে। কিন্তু অসুবাদী কোনও কৃষককে তো আত্মহত্যা করতে দেখি না। কেন, সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? অসুররা ভাবে, অসু তাদের পরিত্রাতা। ঘরে খাবার না থাকলে অসু-মন্দিরে গেলে দু-মুঠো তো জুটবেই, এই ভরসাতেই তারা বেঁচে থাকে। আর আমাদের অভিজ্ঞতা শেখায়, আমাদের দেবতা শুধু পেটমোটা বড়লোকের দেবতা। সেই হতাশাতেই আমরা করি আত্মহত্যা। অথচ দোষটা তো দেবতার নয়, দোষ এইসব মন্দিরের প্রধানদের। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে দেখবে, একদিন অসুবাদ সারা দেশটাকে গ্রাস করে নেবে। সে যাই হোক, এখন চলো। প্রথমে কিছু খাবার জোগাড় করা যাক। তারপর এই শহর থেকে পালানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অসুর-সৈন্যরা আমাদের খোঁজ পাওয়ার আগে।'

'পালাবে? তুমিও পালাবে? কেন?' বলল ছিন্নমস্তা।

'বোন,' বলল মাতঙ্গী, 'আমার গল্পটা তোমার থেকে খুব একটা আলাদা নয়। আমিও অসুরদের নাগাল থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। তবে তোমার থেকে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা আমার বেশি। তাই তোমার মতো দশা হয়নি আমার। অসুরদের জব্দ করার অনেকরকম প্যাঁচপয়জার জানি আমি। চলো, আমার সঙ্গে থাকলে এক এক করে সব শিখিয়ে দেব তোমাকে।'

'কোথায় যাবে? যেখানেই যাবে, সেখানেই তো রয়েছে অসুররা।'

'এই উত্তরাপথে একটাই জায়গা রয়েছে, যেখানে এখনও ওরা ঢুকতে পারেনি। ব্রহ্মা। সেখানেই যাবো ঠিক করেছি। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

মাসতিনেক পরের কথা।

প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে অধীর পদক্ষেপে পদচারণা করছিলেন মহারাজ অমিতবল। প্রাসাদের সিংহদরজা আজ

অর্গলাবদ্ধ। সেই বন্ধ দরজার বাইরে জড়ো হয়েছে সহস্রাধিক নাগরিক। তাদের সম্মিলিত চিৎকারে কান পাতা দায়। নাগরিকদের দোষ দেওয়া যায় না। গত মাসখানেক ধরে গঙ্গানগর অবরুদ্ধ হয়ে আছে। আর সে অবরোধ যে শীঘ্রই হটে যাবে, এমন কোনও সম্ভাবনা নেই। প্রতিদিন অবরোধকারীর সংখ্যা বাড়ছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিক্ষুব্ধ নাগরিকরা এসে জড়ো হচ্ছে অলতুতে। হাট বন্ধ, দোকানপাট বন্ধ। কালোবাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তবু জনসাধারণের যাবতীয় ক্ষোভ কেন্দ্রীভূত হয়েছে রাজার ওপর। অবরোধকারীদের ওপর নয়। কেন, তা শক্তিমাতাই জানেন।

সিংহদরজার ওপারে সমবেত জনতার ভিড়ে মিশে দাঁড়িয়েছিল বিরুপাক্ষ। শুনছিল লোকেদের কথোপকথন।

'এই রাজাটাই যত নষ্টের গোড়া।'

'রাজ্য সামলাতে পারে না, একটা সামান্য অবরোধ হঠাতে পারে না, রাজা হয়েছে কী করতে?'

'মায়াবলীকে দোষ দেওয়া যায় না। উনি তো রাজ্যের গরিব মানুষদের অধিকারের জন্য লড়ছেন।'

'ঠিক কথা। সব দোষ এই রাজাটার। নিজের বোনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করতে পারছে না?'

'লোভী রাজা। নিজের লোভের জন্য চাষিদের জমি কেড়ে নিচ্ছে। মাঝখান থেকে আমরা পাচ্ছি শাস্তি।'

'দরজায় খিল দিয়ে ভেতরে লুকিয়ে বসে আছে, ভীতু রাজা।'

'এসময় যদি মহারাজ মহীবল থাকতেন, সবকিছু এক লহমায় ঠিক করে দিতেন।'

মাথা নাড়তে নাড়তে বিরুপাক্ষ ভিড় ছেড়ে বেরিয়ে এল। নাঃ, কিছু করার নেই আর। প্রজাবিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। কী যে ভাবছেন মহারাজ, কে জানে! কিছুই কি খেয়াল করছেন না? এই ডামাডোলের সুযোগ নিয়ে বহিঃশত্রু ব্রঙ্গা আক্রমণ করবে না তো? কোনও বহিঃশত্রু? মহিষাসুর? এই অবরোধের পেছনে কি মহিষাসুরের হাত আছে? মায়াবলীর সঙ্গে কি মহিষাসুরের যোগসাজস রয়েছে? হতেই পারে! কিন্তু এসব কথা কে বলবে রাজাকে। রাজা তো সবকিছু জেনে বসে আছেন। আমার কথা শুনবেন না, কে বাঁচাবে ওঁকে? মাৎস্যন্যায় শুরু হতে চলেছে ব্রঙ্গারাজ্যে। কেউ তা ঠেকাতে পারবে না। সময় থাকতে বরং রাজ্য ছেড়ে পালাই।

পায়ের গতি বাড়িয়ে দিল বিরুপাক্ষ।

'আহুই একমাত্র আরাধ্য। তাঁকে ছাড়া আর কাউকে উপাসনার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড!'

কথাগুলো বারবার মনের দেওয়ালে ধাক্কা মারছিল। ঠিক যেমন করে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার পরেও রাতের দুঃস্বপ্ন ধাক্কা মারে সচেতন মনের পর্দায়। অস্বস্তিতে ভরিয়ে দেয় মনটাকে। মাথার ওপরে মিটমিট করছে অগুনতি তারা। আকাশের পারাপারে কে যেন এইমাত্র চকখড়ি দিয়ে ছায়াপথ এঁকে দিল। হিরের গুঁড়োর ওপর হিরের কুচি ছাওয়া পথ। আজ বোধহয় অমাবস্যা। চাঁদের দেখা নেই নির্মেঘ আকাশে। মিশকালো অন্ধকারে সমুদ্র-সমান নদীতীরে বসে দুর্গা।

'এই তো সবে ফিরলি। আবার এত তাড়াতাড়ি চলে যাবি!' বলেছিল মা। সে তো গতকাল ভোরের কথা। ভোররাতে যাত্রা শুরু করেছিল, হিমালয়ের কোলে ওদের ছোট্ট গ্রামটা থেকে। থলি ভর্তি করে শুকনো পিঠে, ফল ও শুকনো মাংস দিয়েছিল মা। চামড়ার থলিতে জল। বাবা কিছু তামার পয়সা দিয়েছিল দুর্গাকে। বহু কষ্টে জমানো— ওই পয়সাগুলো। বলেছিল, 'দূরদেশে যাচ্ছিস মা, শহুরে মুলুকে। জানি না কবে ফিরবি। জানি না তুই যেদিন লেখাপড়া সেরে ফিরে আসবি, সেদিন আমি বেঁচে থাকবো কিনা।'

'বাবা,' গলা ধরে এসেছিল দুর্গার, 'তুমি যদি বলো, তাহলে আমি কোথাও যাবো না।'

'না, মা,' বলেছিল বাবা, 'তোর প্রতিভা এ গ্রামে আটকে থাকার মতো নয়। জম্বুদ্বীপের সেরা এই তালীবনশ্যাম বঙ্গ, আর বঙ্গদেশের সেরা ওই গঙ্গানগর। জম্বুদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরা সেখানেই থাকেন। সেখানেই তোর প্রতিভার সত্যিকারের কদর হবে। এই গ্রামে পড়ে থেকে কী করবি? আমার মতো জঙ্গলে জঙ্গলে শিকার ধরে বেড়াবি সারাজীবন?'

বঙ্গ। বাবা 'ব্রঙ্গ' বা 'ব্রঙ্গা' উচ্চারণ করতে পারে না, বলে 'বঙ্গ'। ঠিক যেমন ওই আগন্তুক 'অসু' উচ্চারণ করতে পারছিল না। বলছিল 'অহু' বা 'আহু'। গুরুমশাই বলেছিলেন, ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের লোকেরা অনেকে 'স'-কে 'হ' বলে। এই লোকটা বোধহয় সেখান থেকেই এসেছে। চিঙ্কার পিঠে চড়ে বসার আগে মা কোমরে বেঁধে দিয়েছিল শক্তি-মা'র সিঁদুর-মাখা খড়্গটা। হাতে বেঁধে দিয়েছিল এই মণিবন্ধটা। লাল

কাপড়ের ওপর সোনালি সুতো দিয়ে শক্তি-মা'র মন্ত্র আঁকা রয়েছে মণিবন্ধতে। বলেছিল, 'মা মহামায়া তোকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।'

একরাশ মন-খারাপ নিয়ে শেষবারের মতো বরফ-ঢাকা উঁচু উঁচু পাহাড়গুলোর দিকে পেছন ফিরে তাকিয়েছিল দুর্গা। কেমন দেখাবে আকাশখানা, ওই পাহাড়গুলো ছাড়া? চিঙ্কা মহা-উৎসাহে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলেছে সামনে দিকে, পেছন ফিরে তাকানোর ওর কোনও ইচ্ছেই নেই। দেখতে দেখতে মা-বাবার চেহারাদুটো ঝাপসা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর ছবির মতো সুন্দর গ্রামটাও পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে সমতলে পৌঁছালো দুর্গা, সূর্য তখন মাথার ওপর। দূর থেকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেল। যেদিকে দুচোখ যায়, শুধু সবুজ আর সবুজ, কাঁচা সোনার আলোয় ঝলমল করছে। ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গার যুগল আলিঙ্গনে আবদ্ধ ব্রহ্মা, গায়ে তার সবুজ ধানক্ষেতের চাদর, মাথায় হিমালয়ের মুকুট, সমুদ্র পা ধুইয়ে দিচ্ছে, এমনটি কী আর কোথাও আছে, এ ত্রিভুবনে?

রাস্তায় একবারই থেমেছিল দুর্গা, রাতে বিশ্রাম নেবার জন্য। দুদিন পথ চলার পর পৌঁছালো গঙ্গার পাড়ে, তখন সন্ধ্যে নেমেছে। খেয়া-পারাপারের মাঝি বাড়ি চলে গেছে, আজ রাতের মতো ওপারে যাবার পথ বন্ধ। পিঠ থেকে নেমে লাগাম ও জিন খুলে চিঙ্কাকে ছেড়ে দিল দুর্গা। এদিক-ওদিক দেখে, গা-ঝাড়া দিয়ে, নাক দু'বার কুঁচকে চিঙ্কা দৌড়ে ঢুকে পড়ল পাশের জঙ্গলে, খাবার জোগাড় করতে। বেচারা দু'দিন শুধু শুকনো মাংস খেয়ে আছে। নদীর পাড়ে বসে খড়্গ ও কোমরবন্ধ খুলে পাশে রাখল দুর্গা। থলি থেকে বার করে শুকনো পিঠে চিবোতে চিবোতে অনেকক্ষণ ধরে সূর্যাস্ত দেখল। আলোয় ঝলমল করছে অথৈ গেরুয়া জল। মুহুর্মুহু নানারঙের ঢেউ জাগছে তার বুকে। বিচিত্র সব রং। দুর্গা ভাবছিল, কোনটা বেশি সুন্দর। হিমালয়, না গঙ্গা? পাহাড়ে বরফে সূর্যাস্তের রংয়ের ছটা অবর্ণনীয় রূপে বর্ণালী সৃষ্টি করে। জন্ম থেকে প্রতিদিন ও সেই দৃশ্য দেখে এসেছে। সমুদ্রের মতো বিশাল এই নদীর ওপর সেই সূর্যাস্তের রংয়ের এক অন্য রূপ। জীবনে প্রথমবার তা দেখে নতুন করে মুগ্ধ হল দুর্গা। সম্মোহিতের মতো বসে ছিল অনেকক্ষণ। আচমকাই খুব কাছ থেকে গম্ভীর গলার স্বর শুনে চমকে উঠল।

'আহুলা ধর্মই একমাত্র সত্যধর্ম। বাকি সব ব্যাভিচার মাত্র। আহুই একমাত্র আরাধ্য। তাঁকে ছাড়া আর কাউকে উপাসনার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। মূর্খ নারী, তোমার ওই মণিবন্ধটি তুমি খুলে জলে ফেলে দাও।'

দুর্গা মুখ ফিরিয়ে ভালো করে দেখল আগন্তুককে। পরনে তাপ্পিমারা ময়লা আলখাল্লা। থুতনির ওপর চাপ দাড়ি, চোখে কোণে কালি। দু'চোখ থেকে ক্রুরতা ও লোভ যেন ঝরে ঝরে পড়ছে। মাথায় শিরস্ত্রাণ, সম্ভবত মোষের করোটি থেকে তৈরি। বিরাট দুটো শিঙ মাথা থেকে হাত বাড়িয়েছে দুদিকে।

'তুমি অসুর উপাসক?' বলল দুর্গা, 'ভালো। কিন্তু আমাকে আমার মণিবন্ধ খুলে ফেলতে বলছ কেন?'

'তুমি কি ভিনদেশী? এদেশের আইন-কানুন কিছু জানো না?'

'ভিনদেশী নই,' বলল দুর্গা, 'আমি পাহাড়ের মেয়ে। কেন?'

'জম্বুদ্বীপের অধিপতি, ত্রিভুবন যাঁর বশ, সেই মহাবলী মহিষাসুর ঘোষণা করেছেন, যে আহুর উপাসনা করবে না, তার শিরশ্ছেদ করা হবে।'

'বটে!' বলল দুর্গা, 'আর তুমি বুঝি সেই আইন দেশজুড়ে বলবৎ করতে বেরিয়েছ?'

'মহিষ ইহলোকে আহুর সাক্ষাৎ প্রতিরূপ', বলল আগন্তুক, 'তাই আমরা সবাই মহিষের দাস। তাঁর আদেশ পালন করা ও করানো আমাদের পবিত্র কর্তব্য।'

'পবিত্র কর্তব্য?' দুর্গার গলায় শ্লেষের সুর, 'সে তো বুঝলাম, কিন্তু তুমি ভুল জায়গায় খাপ খুলেছ বন্ধু। এটা ব্রহ্মাহ্রদিদের এলাকা। সবার স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকার আছে এখানে।'

'অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ে তুমি। কিছুই জানো না। এটা আর ব্রহ্মাহ্রদিদের এলাকা নেই। গঙ্গানগরের পতন হয়েছে।'

'অসম্ভব! ব্রহ্মাধিপতি মহারাজ অমিতবলকে হারাবে, এমন মানুষ কে আছে এই পৃথিবীতে?'

'সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর দিগ্বিজয়ী মহিষাসুরের সামনে তোমারে এই অমিতবল দু'দণ্ডও দাঁড়াতে পারেনি।'

'বিশ্বাস করি না।' সদর্পে বলল দুর্গা।

'তাতে কিছু আসে যায় না, অবাধ্য নারী।' বলল আগন্তুক, 'তুমি মহিষাসুরের আদেশ পালন করবে কিনা, সেটা বলো।'

'মণিবন্ধ খুলে ফেলবো? তোমার কথায়?' হা-হা করে হেসে উঠল দুর্গা, 'তার আগে বলো তো, তোমার কবজিতে ওই উল্কিটা কী? মনে হচ্ছে অগ্নিচিহ্ন। তুমি কি এককালে অগ্নি-উপাসক ছিলে? এখন অগ্নিদেবকে ত্যাগ করে অসুকে ধরেছ, কিন্তু উল্কিটার মায়া ত্যাগ করতে পারোনি?'

দপ্ করে জ্বলে উঠল আগন্তুকের ক্ষুধিত চোখদুটো। চিৎকার করে উঠল, 'অবাধ্য পৌত্তলিক নারী, বাঁচার কোনও অধিকার নেই তোমার।' মুহূর্তে কোমর থেকে তরোয়াল বের

করে আক্রমণ করল দুর্গাকে। আচমকা আক্রমণে টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল দুর্গা। পাশ থেকে খড়্গ তুলে নিয়ে কোনওক্রমে আক্রমণ প্রতিহত করল। পরমুহূর্তেই 'হুম!' গম্ভীর গর্জনের অভিঘাতে তরঙ্গ উঠল গঙ্গায়। টুঁ-শব্দটি বেরলো না মুখ দিয়ে, নিমেষে আগন্তুকের রক্তাক্ত শরীর মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ছিটকে পড়ল তরোয়াল ও মোষের মুকুট।

'চিঙ্কা, তুই আজ আমার প্রাণ বাঁচালি,' বাহনের পিঠে হাত বুলিয়ে বলল দুর্গা। আরামে গলা দিয়ে ঘুঁ ঘুঁ আওয়াজ বেরলো বিশালদেহী চিঙ্কার, নিজের রক্তমাখা হাতটা চাটতে চাটতে চোখ বুজে চার পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে। লাশটা ঠেলে নদীতে ফেলে দিল দুর্গা। মোষের মুকুট ও তরোয়াল লুকিয়ে ফেলল ঝোপঝাড়ের মধ্যে। তারপর চিঙ্কার গায়ে হেলান দিয়ে বসে রইল গঙ্গার পাড়ে। আগন্তুকের কথাগুলো ঘুরপাক খেতে লাগল মনের মধ্যে। কে এই মহিষাসুর? কেন সে দেশ জুড়ে জোর করে অসুর উপাসনা বলবৎ করতে চাইছে? কিছুক্ষণ পরেই চিঙ্কার নাক ডাকতে শুরু করল। দুর্গা বসে রইল, খড়্গার বাঁটে হাত রেখে। দেখল, ওর অজান্তেই আকাশে অনেক মেঘ জড়ো হয়েছে। ঢেকে ফেলেছে তারাগুলোকে। গোটা আকাশটাকে।

দূরে কোথাও শৃগালের ঐকতান রাত্রির প্রথম যাম ঘোষণা করল। নিরন্ধ্র গগনপট মেঘের চাদরে ঢাকা। অন্ধকার চরাচর। কালো নয়, নীল আঁধার। প্রকৃতি ভাস্বর অজানা এক আলোকে।

আজ রাতে ঘুম আর আসবে না।

ভোররাতে খেয়া-নৌকায় গঙ্গা পার হয়েছিল দুর্গা। সেখান থেকেই ওর সঙ্গে চলেছে এই রাস্তাটা। নাক বরাবর সোজা গঙ্গানগর পর্যন্ত গেছে।

দু'ধারে ঘন জঙ্গল। হিমালয়ের জঙ্গলের মতো নয়, অন্যরকম জঙ্গল। গরম সোঁদা গন্ধ বাতাসে। ভেজা ঘাসের গন্ধ। রকমারি শব্দ ভেসে আসছে জঙ্গলের মধ্যে থেকে। জলের কুলুকুলু, পাতার খস্‌খস্‌। পাখির ডুবডু, টুইটুই, কুউউউ কুউউউউ। মিহি একঘেঁয়ে ঝিঁঝিঁঝিঁঝিঁ ডাক, কানে তালা ধরে যায়। চিঙ্কা বারকতক এদিক-ওদিক তাকিয়ে নাক কুঁচকে জঙ্গলের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করেছিল, দুর্গার ধমক খেয়ে রাস্তায় ফিরেছে।

সোনালি সূর্য তখন গাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে, জঙ্গল হঠাৎই ফুরিয়ে গেল। পরিবেশটাই বদলে গেল এক লহমায়। আদিগন্ত ফাঁকা তেপান্তরের মাঠ, তার মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে লালমাটির পথ। দু'ধারে তালগাছের সারি। মাঠে গোরু চরছে, রাখাল গাছতলায় বসে বাঁশি বাজাচ্ছে। মাঝেমাঝে চাষের ক্ষেত, ঝোপঝাড়। কখনও বা একটা গ্রাম। তারপর আবার ধান, পাট, ডাল বা তরিতরকারির ক্ষেত। বড় সুন্দর গ্রামগুলো। বাড়িগুলো মাটির তৈরি, গ্রামের মাঝে পোড়ামাটির ইঁটের মন্দির। কোনও গ্রাম থেকে ভেসে আসছে কুমোরের চাকার ঘর্ঘর, কোথাও তাঁতির তাঁর বোনার খট্‌খট, কোথাও বা কামারের হাতুড়ির ঠনাঠন। গোয়ালা দুধ দুইছে, চাষি চাষ করছে। কথক-ঠাকুর অশ্বত্থতলায় বসে পুঁথি পড়ছে। সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত, কেউ বসে নেই। এরই মাঝে কেউ কেউ অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছে দুর্গা আর ওর বাহনকে।

'পূর্বে কামাখ্যা, পশ্চিমে হিঙ্গুলা', বলেছিল যোগিনী, 'এর মাঝখানে ছড়িয়ে আছে বহু শক্তিপীঠ। তার বেশিরভাগই তো রয়েছে ব্রহ্মায়'। হুঁ, যোগিনীর কথা অনুসারে এখানেই কোথাও একটা শক্তিপীঠ থাকার কথা। কোথায় সেটা? ভাবছিল দুর্গা।

কিছুক্ষণ পর আবার শুরু হল জঙ্গলের এলাকা। রাস্তার দুদিকেই ঘন জঙ্গল। তখন সন্ধ্যে নামবো নামবো করছে, এমন সয় একটা বিশ্রী গন্ধ নাকে এল। কোত্থেকে আসছে গন্ধটা? দুর্গার ইশারায় চলার গতি বাড়িয়ে দিল চিঙ্কা। একটু পরেই রাস্তার ডানদিকে জঙ্গলটা শেষ হয়ে গেল। সেখান থেকে বেরিয়ে এল ধূ-ধূ এক তেপান্তরের প্রান্তর। সে প্রান্তরে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবড়ো-খেবড়ো পাথর। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মতো উষ্ণ প্রস্রবণের কুণ্ড। টগ্‌বগ্‌ করে জল ফুটছে, কটু গন্ধকাগন্ধী ধোঁয়া বেরোচ্ছে সেগুলো থেকে। গুনে দেখলো দুর্গা, সাতটা কুণ্ড। তাদের মাঝখানে পাহাড়ের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটা মন্দির। লাল পোড়া মাটির আটচালা মন্দির। বড্ড চেনা সে মন্দিরটার গড়ন। দুর্গার ইশারায় চিঙ্কা পথ ছেড়ে এগিয়ে গেল মন্দিরের দিকে। কালচে ছোপ মন্দিরের সারা গায়ে। গন্ধকের গন্ধ ছাপিয়ে বিশ্রী গন্ধটা হঠাৎই তীব্র হয়ে উঠল। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। মন্দিরের সামনে গিয়ে চিঙ্কার পিঠ থেকে নামলো দুর্গা। কাছে গিয়ে দেখল, কালচে ছোপগুলো আসলে পোড়ার দাগ। কেউ মন্দিরটায় আগুন লাগিয়েছিল, পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল। নেহাত পোড়ামাটির বলে একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়নি। কিন্তু মন্দিরের জানালা দরজা, এমনকী চৌকাঠ পর্যন্ত

পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

একরাশ আশঙ্কা ও ভয় নিয়ে মন্দিরের ভেতর ঢুকলো দুর্গা।

এ মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ষোড়শভুজা শক্তিমাতা। তাঁর সিন্দুরচর্চিত অষ্টধাতুর বিগ্রহের মাত্র তিনটি বাহুই অবশিষ্ট আছে। বাকি বাহুগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে চারপাশে। বিগ্রহের সর্বাঙ্গে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। কেউ যেন অসীম ক্রোধে মাতাকে আসনচ্যুত করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। রক্তস্রোতে ভিজে কালচে-লাল রং নিয়েছে বেদীমূল।

'মা, তুই এলি শেষপর্যন্ত?' কাতর কণ্ঠের কান্নায় চমকে উঠল দুর্গা।

'কে ওখানে?'

'আমরা যে হেরে গেলাম মা! ওদের সাথে লড়াইয়ে পারলাম না। সবকিছু একেবারে শেষ করে দিয়ে গেল ওরা!'

দুর্গা দেখল, এক অশীতিপর বৃদ্ধ, দুটি হাতই তার বিচ্ছিন্ন, রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা শরীর, পড়ে আছে মায়ের পায়ের তলায়। বৃদ্ধের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে তার মাথাটা কোলে তুলে নিল দুর্গা।

'একটু জল!' অস্ফুট স্বরে বলল বৃদ্ধ।

চিঙ্কার পিঠ থেকে চামড়ার তৈরি জলের থলিটা টেনে নামালো দুর্গা। বৃদ্ধের মুখে জল ঢেলে দিল একটু একটু করে। শান্ত হল বৃদ্ধ। কিছুক্ষণ মুগ্ধ নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল দুর্গার মুখের দিকে। ধীরে ধীরে বৃদ্ধার চোখ থেকে যন্ত্রণা মুছে গিয়ে সেখানে ছড়িয়ে পড়ল অপার এক প্রশান্তি। 'মা, জগজ্জননী মা আমার। তুই এ অবিচারের প্রতিকার করিস। পচাগলা এ লাশের পাহাড়ের ওপর তুই প্রতিশোধের আগুন জ্বালিস। মা... মা আমার...' এই বলে দুর্গার কোলে পরম নিশ্চিন্তে এলিয়ে পড়ল বৃদ্ধ। ঘোলাটে হয়ে এল চোখ। তারপর একেবারে স্থির।

বৃদ্ধের মৃতদেহ কোলে তুলে নিয়ে মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এল দুর্গা। তখনই নজরে পড়ল দৃশ্যটা। মন্দিরের পেছনদিকে বেশ বড় একটা দীঘি। কাকচক্ষু জল কানায় কানায় ভর্তি। ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে দীঘিতে। সেই সিঁড়ির পাশেই বিরাট একটা গর্ত খোঁড়া হয়েছে সদ্য। প্রায় পঞ্চাশটা মৃতদেহ পড়ে আছে তার মধ্যে। কুপিয়ে কুপিয়ে কাটা হয়েছে দেহগুলোকে। প্রতিটি দেহই মুণ্ডহীন। খানিকটা দূরে খাড়াই উঁচু এক সদ্যনির্মিত স্তম্ভ থেকে এখনও রক্ত গড়াচ্ছে। নরমুণ্ড দিয়ে তৈরি সে স্তম্ভ।

গা গুলিয়ে উঠল দুর্গার।

বৃদ্ধের মৃতদেহ সেই গর্তেই শুইয়ে দিল দুর্গা। স্তম্ভ ভেঙ্গে মুণ্ডগুলো জড়ো করল সেখানে। পাশের জঙ্গল থেকে কাঠ আহরণ করে এনে চিতা সাজালো গর্তের ওপর। আগুন যখন জ্বলে উঠল, চিতার পাশ থেকে সরে গিয়ে মন্দিরের বারান্দায় বসলো দুর্গা। চামড়ার থলি থেকে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেল। খানিকটা জল ঢেলে দিল মাথায়, ঝাপটা দিল মুখে। কে এই মন্দিরে এরকম নারকীয় ধ্বংসলীলা চালিয়েছে? কেন করেছে এরকম জঘন্য কাজ? কী ক্ষতি করেছিল এরা? বৃদ্ধ কেন ওকে 'মা' বলে ডাকল? কোন সে অবিচারের প্রতিকার করতে হবে দুর্গাকে?

দাউদাউ করে জ্বলছে চিতা। আগুনের ফুলকি ছুটছে ঊর্ধ্বমুখে, মুহূর্তে মিলিয়ে যাচ্ছে আঁধারে। যেন একঝাঁক ক্ষণজন্মা জোনাকি। জন্মাচ্ছে, জীবনের পূর্ণাহুতি দিয়ে সানন্দে মরছে, আবার জন্মাচ্ছে। বৃদ্ধের মুখটা ঠিক গ্রামের পাঠশালার গুরুমশাইয়ের মতো। লোলচর্মসম্বল মুখটা সেরকমই বিশ্বাস ও স্নেহে ভরপুর। কোটরাগত চোখদুটো ঠিক সেরকমই জ্ঞানের তেজে ভাস্বর।

'বুঝলি মা, মেরুদণ্ডের মূলে রয়েছে মূলাধারচক্র', বলছিলেন গুরুমশাই, 'উঁ? অন্যমনস্ক মনটাকে ঝটকা দিয়ে গুরুমশাইয়ের কথায় ফিরিয়েছিল দুর্গা। সেদিনও একই উদ্দেশ্যে পথ চলছিল ও। জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে। সে তো বছর দুয়েক আগের কথা। সেদিন গুরুমশাই ছিলেন পথপ্রদর্শক। আজ ও একা।

উচ্চ হিমালয়ের বন্ধুর রুক্ষ পাহাড়ের সারি, খয়েরি ধুলোয় ঢাকা। আকাশছোঁয়া, দুর্গম। আকাশ আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে তারা, পরতের পর পরত। নীচ থেকে ওদের দিকে তাকালে মনে ভয় ধরে। চূড়ায় ওদের বরফের টুপি, এই গ্রীষ্মকালেও। দুই পাহাড়ের ফাঁকে সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম। তার মধ্যে দিয়ে পথ খুঁজে নিয়ে পথ চলা সহজ কাজ নয়।

'এর ঠিক ওপরে নাভির সন্নিকটে রয়েছে স্বাধিষ্ঠানচক্র'— বলছিলেন গুরুমশাই, 'আর তার ঠিক ওপরে বক্ষপিঞ্জরের যোগস্থলে রয়েছে মণিপুরকচক্র। আরেকটু ওপরে হৃদয়ের সন্নিকটে রয়েছে অনাহতচক্র। কণ্ঠমূলে রয়েছে বিশুদ্ধাচক্র। ভ্রূমধ্যে রয়েছে আজ্ঞাচক্র। আর ব্রহ্মতালুর কেন্দ্রে রয়েছে সহস্রারচক্র।'

'কিন্তু গুরুমশাই,' প্রশ্ন করেছিল দুর্গা, 'শল্যচিকিৎসা শাস্ত্রের পুঁথিতে শব-ব্যবচ্ছেদের বহু ছবি দেখেছি। মানব-শরীরের নানান যন্ত্রাংশের ছবি রয়েছে তাতে। কিন্তু এইসব চক্রের কোনও ছবি দেখিনি সেখানে।'

'মা,' বলেছিলেন গুরুমশাই, 'প্রদীপের শিখা নিভে যাওয়ার পর কেউ যদি তাতে আগুনের হদিশ খোঁজে, সে কি তা

খুঁজে পাবে? মৃত মানব-শরীরে চক্র খুঁজে লাভ নেই।'

'তবে কোথায় খুঁজে পাবো এইসব চক্রকে?'

'জীবিত মানব-শরীর জুড়ে নিরন্তর এক বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে। সেই বিদ্যুৎপ্রবাহই সূক্ষ্মশরীর। এই সাত চক্র সেই সুক্ষ্ম শরীরেরই অংশ। তাই স্থূলশরীর ব্যবচ্ছেদ করে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না।'

'সেই সূক্ষ্মশরীরকে কি দেখা যায়?'

'প্রশ্নটা জমিয়ে রাখ মা,' বলেছিলেন গুরুমশাই, 'যার কাছে তোকে নিয়ে যাচ্ছি, তিনি সূক্ষ্ম শরীর সম্পর্কে যতটা জ্ঞান রাখেন, এ জম্বুদ্বীপে ততটা আর কেউ বোধহয় রাখে না।'

ওদের গ্রামের পাশ দিয়ে বরফগলা একটা নদী বয়ে গেছে। কিছুদূর এগিয়ে ঝরনা হয়ে ঝাঁপ দিয়েছে সমতলে। কোত্থেকে এসেছে নদীটা? কে জানে! এর আগে দু'একবার দুর্গা চেষ্টা করেছিল, নদীর উৎস পর্যন্ত যাওয়ার, একা একা। টানা দু-তিনদিন হেঁটেও সে উৎস খুঁজে পায়নি, ফিরে এসেছিল হতোদ্যম হয়ে। মা কত্ত বকাঝকা করেছিল তাই নিয়ে। সেই নদীর পাড় ধরেই হেঁটে চলেছিল সেদিন, গুরুমশাইয়ের সঙ্গে, উত্তর-পূর্ব দিক বরাবর। 'আসনসিদ্ধিই হল গোড়ার কথা, বুঝলি মা।' বলেছিলেন গুরুমশাই। তা, সেটা কি আর জানে না দুর্গা? দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এক আসনে বসে থাকা। ওই আসনেই লেখাপড়া। সাথে ধ্যান, প্রাণায়াম, সমাধি। দিনে একবার মা এসে একটু দুধ খাইয়ে যেত। প্রথম ক'দিনের পর ক্ষুধাতৃষ্ণা উবে যেত। শরীরবোধ লোপ পেত। গুরুমশাই বলতেন, 'আসনসিদ্ধি না হলে কোনও শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, বুঝলি মা! যদি একভাবে প্রহরের পর প্রহর বসে না থাকতে পারলি, তবে একাগ্রচিত্তে কোনও বিদ্যার অভ্যাস করবি কী করে?'

প্রায় তিনদিন হাঁটার পর সঙ্গী সেই শীর্ণকায়া তটিনীটি মিলিত হল তার উৎসে, সাগরপ্রমাণ এক নদে। সেখানেই ঘাট থেকে নৌকা ধরলো ওরা। দু'দিন নদীপথে পূর্বাভিমুখে চলার পর ওরা এসে পৌঁছলো পূর্বী হিমালয়ের বাঁকে, সমৃদ্ধ এক নদীবন্দরে। সেইখান থেকে শুরু হল পাহাড়ে চড়া। পাকদণ্ডী বেয়ে সারাদিন ওঠার পর সন্ধ্যের ঠিক আগে পাহাড়ের আড়ালে উঁকি দিল লাল পাথরে গড়া এক মন্দিরচূড়া। মুগ্ধচোখে তাকিয়ে দেখল দুর্গা। 'তন্ত্রসাধনা শেখার এর চেয়ে উপযুক্ত স্থান জম্বুদ্বীপে আর নেই, বুঝলি মা।' বললেন গুরুমশাই।

গা-ছমছম অন্ধকার। ঘন জঙ্গলে ঢাকা সবুজ পাহাড়, তারই মধ্যে ছোট্ট এক ঝরণা পাহাড়ের চূড়া থেকে অনেক নীচে

With Best Compliments From :-

RTS POWER CORPORATION LIMITED

Manufacturers of

E- H - V - GRADE TRANSFORMERS

Power & Distribution Transformers

From 25 KVA to 40 MVA, 132 KV Class

Single Phase Transformers 5 KVA to 25 KVA

Dry Type & Special Type Transformers

Head Office
56, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001
Phones : 2242-6025 / 6054
Fax No, : (033) 2242-6732
E-mail : rtspower@vsnl.net

Howrah Works:
130, Dharamtolla Road
Salkia, Howrah - 711 107
Phone No. : 2655-5376 / 3093-6492

Jaipur Works :
C-174, Vishwakarma Industrial Area, Chomu Road, Jaipur - 302 013
Phone No. : 2330-405 / 2330-269
Fax No. : 0141 2330315
email : rtspower@sancharnet.in

Agra Works :
Mathura Road, P.O. Artoni, Agra - 282 007
Phone No. : (0562) 2641-431

প্রায়-অদৃশ্য সমতলে ঝাঁপ দিয়েছে। সেই ঝরনাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বিস্তীর্ণ এক মহাশ্মশান। মাটি পুরু ছাইয়ে ঢাকা, পা বসে যায় তাতে। অনেক পোড়া গাছ এদিক ওদিক, সেগুলোও পুরু ছাইয়ে ঢাকা। ছড়িয়ে পড়ে আছে অজস্র নরকঙ্কাল, নরকরোটি। প্রতি পদক্ষেপে তারা তাদের অস্তিত্ব জানান দেয়, পায়ের নিচে মট মট শব্দে। ধুনি জ্বলছে জায়গায় জায়গায়। জনবিরল সেই প্রান্তরের একেবারে শেষপ্রান্তে জঙ্গলে ঢাকা এক আটচালা মন্দির। এ মন্দিরে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, তাই মন্দির-সীমানায় এসে দুর্গাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল গুরুমশাই। পুরনো মন্দির। কত পুরনো? দেখে মনে হয় হাজার দু-হাজার বছর তো হবেই। বেশিও হতে পারে। জায়গায় জায়গায় মন্দিরের দেওয়াল ভেঙ্গে পড়েছে, সেখান থেকে বট অশ্বত্থর ঝুরি নেমেছে। মন্দিরের ভেতরে লম্বা চাতাল। সে চাতালের শেষ কোথায়, দেখা যায় না। অন্তহীন সুড়ঙ্গের মতো চলেছে তো চলেছেই। সেখানে ইন্দ্রিয়াতীত বিদেহীদের আনাগোনা অন্ধকারে চুপিসারে। ধমনীতে তাদের গা-ছমছমে অতিন্দ্রীয় অনুরণন। ওরা কি জানে, ওরা বিদেহী? মণ্ডপে সারি সারি প্রদীপ জ্বলছে, প্রদীপগুলো নরকরোটি দিয়ে তৈরি। মধ্যে অধিষ্ঠিত দেবী কালো পাষাণের নারীমূর্তি। সিঁদুর মাখা, লাল কাপড়ে মোড়া। দূরে কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে সমবেত স্বরে মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ। সে মন্ত্র প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মন্দিরের দেওয়ালে দেওয়ালে। তৈরি করছে পরতের পর পরত শব্দব্যূহ। সেই ব্যূহে আটকা পড়েছে কত না ছায়া ছায়া অস্তিত্ব। অন্ধকারের গায়ে পিছনে চরিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা, ছায়ার আবরণ ভেঙ্গে মূর্ত হতে চাইছে। ব্যর্থ তাদের হাহাকারে অমাবস্যার রাতের অন্তর বিদীর্ণ হচ্ছে বারবার। শিউরে উঠল দুর্গা।

শুরু হল ওর নতুন শিক্ষা, নতুন গুরুর অধীনে। প্রথম ক'দিন শুধু আয়ুধকলার স্পর্ধা। একের সঙ্গে দশের স্পর্ধা, বিশ-ত্রিশজনের স্পর্ধা। একের পর এক প্রতিস্পর্ধা। বিচিত্র সব অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা। তারপর শুরু হল আসনবদ্ধ অবস্থায় বিভিন্ন ক্রিয়ার অভ্যাস। এরপর সেইসব ক্রিয়ার সংযোগে আয়ুধকলার অভ্যাস। পাশাপাশি বিভিন্ন দুরূহ প্রক্রিয়ার মনঃসংযোগ, ধ্যান, জপ্, সমাধি।

'তন্ত্র শব্দের অর্থ হল — পদ্ধতি।' বলছিলেন রক্তস্বরা তেজস্বিনী সেই যোগিনী। দুর্গার নতুন গুরু, 'এ হল সূক্ষ্ম শরীরকে জাগ্রত করার পদ্ধতি। তন্ত্রসাধক তার সূক্ষ্ম শরীরকে স্থূলশরীরের মতোই অনায়াসে ব্যবহার করতে পারে। মুক্ত সুক্ষ্ম শরীর স্থূলশরীরের সীমারেখার বন্ধন ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে। এর ব্যবহার তন্ত্রে রয়েছে। সুক্ষ্মশরীরকে প্রসারিত করে প্রতিস্পর্ধীকে দূর থেকে আক্রমণ করা যায়। এমনকী, স্থূলশরীরকে পেছনে ফেলে রেখে সুক্ষ্মশরীর ব্রহ্মাণ্ডের যে কোনও স্থানে পৌঁছে যেতে পারে এক লহমায়। কিন্তু সেসব পরের কথা। প্রাথমিকভাবে যে সমস্যায় তুই পড়বি সেটা হল, যেই মুহূর্তে সুক্ষ্মশরীর স্থূলশরীরের সীমারেখা ছেড়ে বেরোবে, ব্যবহারের সামান্য ত্রুটি সুক্ষ্মশরীরের ক্ষতিসাধন করতে পারে, এমনকি তার বিনাশও ডেকে আনতে পারে। আর সেজন্যই প্রয়োজন যন্ত্রের।'

'আপনি বলেছিলেন', প্রশ্ন দুর্গার, 'যন্ত্র ও মন্ত্র, এই দুই হল তন্ত্রের মূল উপাদান। তাহলে মন্ত্রের কাজটা ঠিক কী?'

'সূক্ষ্মশরীর ক্রিয়াশীল থাকে কম্পনের মাধ্যমে। মন্ত্র সেই কম্পনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ভিন্ন মন্ত্র, ভিন্ন কম্পন, তার মাধ্যমে সূক্ষ্মশরীরকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও গুণ দেওয়া যায়, তাকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায়।'

ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় সম্বিৎ ফিরল দুর্গার। শীত করছে। ভয় করছে। চিতার দাউদাউ আগুন শান্ত হয়ে এসেছে। কিন্তু ধিকিধিকি মন্দলয়ে সে এখনও জ্বলছে। মাতৃভক্তের আত্মত্যাগের আগুন। মন্দিরের চূড়ার দিকে তাকিয়ে দেখল দুর্গা। ধ্বজদণ্ডে স্বর্ণাভ-সিন্দুর পতাকাটি এখনও অক্ষত আছে। আগুনের লেলিহান শিখার মতো মন্দিরশীর্ষ থেকে সে এখনও পত্‌পত্ করে উড়ছে। যেন কাকে ডেকে বলছে, তুমি আমার শরীরটাকেই শুধু ক্ষতবিক্ষত করেছ, আমার প্রাণটাকে ছুঁতে পারোনি। আমার প্রাণভোমরা কোথায় লুকিয়ে আছে, সে বোঝা তোমার সাধ্য নয়। চিঙ্কার পিঠ থেকে কম্বলের আসনটা নামিয়ে আনলো দুর্গা। কম্বল গায়ে জড়িয়ে বসল। হিমালয়ের দুর্গম চূড়ায় সেই শক্তিপীঠের কথা, যোগিনীর কথা আজ বড্ড মনে পড়ছে। সে যদি আজ এখানে থাকতো, ভালো হতো। বহু প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে মনের মধ্যে। কারা এই নরপিশাচ? উপাসনা পদ্ধতির নামে কারা ব্রহ্মায় এরকম নারকীয় হত্যালীলা চালাচ্ছে? হয়তো কিছু উত্তর পাওয়া যেত যোগিনীর কাছে।

যোগিনীর শিক্ষার গুণ, খুব শিগগিরই একদিন ধ্যানরত অবস্থায় তার দেখা পেয়েছিল দুর্গা। সে, যে শরীরের গহনে বাস করে। দেখতে পেল, ওর শরীরের অভ্যন্তরে কোষ থেকে কোষে বয়ে চলেছে নিরন্তর তড়িৎপ্রবাহ, নদীর স্রোতের মতো।

অগণিত জলকণিকার মিলিত গতিশীলতা যেমন করে নদীর রূপ পরিগ্রহ করে, তেমন করেই কোষ থেকে কোষে প্রবহমানা সূক্ষ্ম সেই বিদ্যুৎপ্রবাহ শরীরের রূপ পরিগ্রহ করেছে। অবাক হয়ে দেখেছিল দুর্গা— সে শরীরে হাত আছে, পা আছে, মাথা আছে। এরপর থেকে সেই সূক্ষ্মশরীরের সম্যক উপলব্ধিই হয়ে দাঁড়িয়েছিল দুর্গার দিবারাত্রির ধ্যানজ্ঞান। দ্বন্দ্বযুদ্ধে দুর্গা পটু তো ছিলই। যোগিনীর কাছে শিখল কীভাবে সূক্ষ্মশরীরকে প্রসারিত করে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করতে হয়। শিখল যন্ত্রের ব্যবহার। শিখল কীভাবে মন্ত্র ব্যবহার করে সূক্ষ্মশরীর দ্বারা সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণ করা যায়। বিবিধ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বিবিধ যন্ত্র। শেষমেশ একদিন যোগিনী দুর্গাকে একটা অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে বাইরে থেকে অর্গল লাগিয়ে দিল। 'যতক্ষণ ডাঙার সঙ্গে সংযোগ থাকে, ততদিন সাঁতার শেখা যায় না। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে জলে ঝাঁপ দিলে তবেই সাঁতার শেখা যায়। অনেক কিছু শিখেছিস তুই, এবার সেসব হাতে-কলমে প্রয়োগ কর। তারপর খুলবো এই দরজা।'

ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ। নাকি মাস, বছর? নাকি শুধুই এক পল, এক মুহূর্ত? ধীরে ধীরে জাগলো কুণ্ডলিনী জুড়ে শক্তির ঊর্ধ্বমুখী স্রোত। আসনবদ্ধ দুর্গার মনে অদ্ভুত সব অনুভূতির আনাগোনা। তীব্র ক্ষুধা ও নিদ্রার অনুভূতি। হঠাৎই সেটা এল, আবার বিলীনও হল। জাগলো শারীরিক সম্ভোগের ইচ্ছা। ব্রহ্মাণ্ডের সব সুখ একসঙ্গে সম্ভোগের ইচ্ছা। তাও বিলীন হল, জাগলো ক্রিয়াশীলতা। ভূমণ্ডলের সব সমস্যা এক লহমায় সমাধান করে ফেলবে, এমন আত্মবিশ্বাস জাগলো মনে। পরমুহূর্তে সেই অনুভূতিকে ছাপিয়ে জেগে উঠল অনির্বচনীয় সৃষ্টিসুখ। জগতের যাবতীয় রূপ রস বর্ণ গন্ধ একসঙ্গে ধেয়ে এসে ভাসিয়ে দিয়ে গেল ওকে। শিশুকাল থেকে দেখা প্রতিটি দৃশ্য, প্রতিটি সুর নবরূপে ধরা দিল ওর কাছে এসে। তারপর সেই অনুভূতিকে ছাপিয়ে জাগলো অসীম শক্তির অনুভূতি। হঠাৎ কপালের মধ্যিখানে যেন দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। তার সঙ্গেই, সবকিছু কেমন যেন জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। আর কোনও দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, নেই কোনও বিশৃঙ্খলা, নেই কোনও ভুল বোঝাবুঝি। পরমুহূর্তেই ব্রহ্মতালুতে যেন বিস্ফোরণ হল। মন ভরে গেল এক অনির্বচনীয় আনন্দে। আলোয় আলো হয়ে গেল অন্ধ চরাচর। বাঁধভাঙা সেই আলোর বন্যা একসময় শান্ত হল। দুর্গা দেখল, কুটিরের খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে সূর্যোদয় হচ্ছে। দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন যোগিনী। চোখে তাঁর জল।

'বাড়ি যাওয়ার সময় হল তোর,' বলল যোগিনী।

'এত তাড়াতাড়ি?' অবাক হল দুর্গা।

'আমার যা জ্ঞান, সব তোকে শিখিয়ে দিয়েছি। তুই আজ আমায় নিঃস্ব করে দিয়েছিস। তুই কি জানিস, আজ পর্যন্ত কেউ... কোনও শিক্ষার্থী এত ছোটো বয়সে এখান থেকে সব শিক্ষা সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরতে পারেনি। কে তুই মা?'

হঠাৎ করেই শরীর জুড়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শ্রান্তির বোধগুলো সব ফিরে এসেছিল তখন। ঠিক আজকের মতো। খুব খিদে পেয়েছে। কিন্তু খাওয়ার কথা ভাবতেই গা গুলিয়ে উঠছে। খুব শীত করছে। ইচ্ছে করছে, মা-কে জড়িয়ে ধরে ঘুমোতে। অনেকক্ষণ ঘুমোতে। ছাইয়ের আভরণ শরীরে জড়িয়ে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়েছে ভক্ত-চিতা। নিরন্ধ্র অচক্ষু অন্ধকার গ্রাস করেছে চরাচর। তবু কেন এক মুহূর্তের জন্যও ঘুম এল না চোখে।

রাতটা সেই ভক্ত-শ্মশানে জেগে কাটিয়ে দিল দুর্গা।

পরপর দু'রাত জাগা। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে। তবু বিরামহীন পথ চলা। পরদিন সন্ধ্যা নামার একটু আগে বিদ্যাধরী নদীর উত্তর পাড়ে পৌঁছলো দুর্গা। গঙ্গানগর এই নদীরই অন্য পাড়ে। শহরে ঢুকতে গেলে সেতুর এই পাড়ে সীমান্তরক্ষী ছাউনি থেকে অনুমতি নিতে হয়।

'কোথায় যাচ্ছ?', জিজ্ঞেস করল সীমান্তরক্ষী।

'অক্ষুমুনির গুরুকুলে। এই যে পাঠশালার গুরুমশাইয়ের চিঠি', থলি থেকে বার করে এগিয়ে দিল দুর্গা।

'ঠিক আছে,' চিঠি পড়ে মাথা নাড়ল রক্ষী, 'তুমি যেতে পারো, কিন্তু তোমার এই ভয়ানক জন্তুটিকে এখানে ছেড়ে যেতে হবে।'

'কেন?' আশঙ্কায় চিঙ্কার গলার কাছের রোঁয়াগুলো আঁকড়ে ধরল দুর্গা।

'বাঘ বা সিংহ নিয়ে শহরে ঢোকার নিয়ম নেই', বলল প্রহরী।

'আমার চিঙ্কা বাঘ বা সিংহ কোনওটাই নয়,' সগর্বে বলল দুর্গা।

'তবে কি এটি?'

'চিঙ্কা হল বাংহ,' বলল দুর্গা, 'ওর বাবা বাঘ, মা সিংহ।'

'এরকমটি আবার হয় নাকি?' রক্ষীর গলায় অবিশ্বাস।

'হয়, আমাদের পাহাড়ি অঞ্চলে হয়,' বলল দুর্গা,

‘একমাত্র হিমালয়েই বাঘ-সিংহ দুটোই পাওয়া যায়, তাই। যাই হোক, বাংহ নিয়ে কোনও আইন আছে কি, আপনার বইতে?’

‘না, তা নেই, তবে...’

‘তবে আর কিছু নয়,’ বলল দুর্গা, ‘আইন যখন নেই, তখন চিঙ্কাকে আপনি আটকাতে পারেন না। আমার হাতে আর সময় নেই। চললাম, নমস্কার।’

চিঙ্কার পেটে গোড়ালি দিয়ে চাপ দিল দুর্গা। মুহূর্তে হতভম্ব সীমান্তরক্ষীকে পেছনে ফেলে রেখে লাফিয়ে সীমান্ত-বেষ্টনী পার হয়ে গেল চিঙ্কা।

ব্রহ্মার দক্ষিণপ্রান্তে সমুদ্রের মোহনায় অসংখ্য ছোট বড়ো দ্বীপ রয়েছে। এরকম সাতাশটা দ্বীপকে সেতু দিয়ে জুড়ে তৈরি হয়েছে গঙ্গানগর। পৃথিবীর বর্ধিষ্ণুতম নগরী। এখান থেকে বাণিজ্যপোত যায় পৃথিবীর সেরা বন্দরগুলোতে। ব্রহ্ম, শ্যাম, সুমাত্রা, মহার্লিকা, যবদ্বীপ, কালীমন্থন, চিহ্ন, মিশ্র, যবন— এমনকি পাতালদেশ পর্যন্ত যায় ব্রহ্মার পসরা। সেসব বাণিজ্যপোত পাহারা দিতে ব্রহ্মা-নৌসেনার তিনশো রণতরী পাহারা দেয় সপ্তসমুদ্র। ব্রহ্মারাজের নৌসেনা ও হস্তীসেনার ভয়ে কাঁপে ধরাধাম। লোকে বলে, এক লক্ষ রণহস্তী আছে ব্রহ্মারাজের। ব্রহ্মার ধনুর্ধররা শরক্ষেপণে সিদ্ধহস্ত। তাদের বিষ-তির মুহূর্তে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেয় যে কোনও প্রাণীকে। সোনায় মোড়া এই গঙ্গানগর বহু রাজাই আক্রমণ করেছে যুগে যুগে। তাদের সবার মৃতদেহ পোঁতা আছে মাতলী নদীর ওই কালো কাদায়।

চওড়া বাঁধানো রাস্তা। রাস্তার ধারে জলনিকাশী নালা। প্রতিটি নালার প্রস্থ সমান। তার ধার ধারে সারবন্দি পোড়ামাটির তৈরি দোতলা বাড়ি। পোড়ামাটির ইঁটের গায়ে খোদাই করা নানান পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনি। প্রতিটি বাড়ির প্রতিটি ইঁটের দৈর্ঘ-প্রস্থ-উচ্চতা সমান। প্রতিটি বাড়ির সামনে অভিন্ন আয়তনের নাম-ফলক, সোনার তৈরি। সোনার পাত বাড়ির জানালায়, দরজায়। একুশটা রাস্তা শহরের উত্তর-দক্ষিণে গেছে, বারোটা রাস্তা পূর্ব-পশ্চিমে। যেখানে রাস্তাগুলো একে অপরকে কেটেছে, সেই চৌমাথার মোড়গুলোতে রয়েছে সোনার স্তম্ভ, মাথায় একটি করে পশুর মূর্তি। হস্তীস্তম্ভ, ব্যাঘ্রস্তম্ভ, বরাহস্তম্ভ, নাগস্তম্ভ— এইরকম। রাস্তায় ছোট ছোট নদী পড়ছে মাঝেমাঝেই। নোনাজলের নদী, ওপরে বাঁশের সেতু। সে সেতু এমনই মজবুত, রণহস্তী দৌড়ে গেলেও তার কোনও ক্ষতি হবে না। স্থাপত্যের নিয়মের নিগড়ে বাঁধা শহরের প্রতিটি অংশ ব্রহ্মাবাসীদের উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে শিল্পনৈপুণ্যেরও পরিচয় বহন করছে। নতুন জায়গা দেখে উৎসাহে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে চিঙ্কা। রাস্তায় লোকজন খুব কম। এতবড় শহর, রাস্তায় এত কম লোক কেন? পথচলতি যে দু-একজনের দেখা মিলছে, সে চমকে সরে যাচ্ছে রাস্তা ছেড়ে, চিঙ্কার ভয়াবহ আকৃতি দেখে। এক চৌরাস্তার মোড়ে দেখতে পেল দুর্গা, সোনার স্তম্ভের মাথায় মকরমূর্তি। হ্যাঁ, এই জায়গাটার কথাই তো বলেছিলেন পাঠশালার গুরুমশাই। এখান থেকে পশ্চিমে একটা রাস্তা চলে গেছে। সেটা ধরে নাক-বরাবর এগিয়ে গেলে পড়বে সমুদ্রতীর। সেখানেই আছে অক্ষুমুনির গুরুকুল।

সন্ধ্যা হলো, কিন্তু কোনও বাড়ি থেকেই শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি শোনা গেল না।

শহরতলীর এলাকাতে এসে পড়েছে দুর্গা। এখানকার বাড়িগুলো শহরের থেকে অনেকটাই অন্যরকম। খড়ের তৈরি চারচালা বা আটচালা বাড়ি। মাটির দেওয়াল, তার গায়ে চকখড়ির কারুকার্য। প্রতিটি বাড়ির চারপাশে অনেকটা ফাঁকা জমি। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি বেড়া গৃহস্থের জমির সীমানা নির্দেশ করছে। প্রতিটি বাড়ির সামনে ফুলের বাগান, ঔষধি বৃক্ষ ও লতাগুল্ম। বাড়ির পেছনে সবজিবাগান ও গোশালা। গোবর নিকোনো উঁচু দেউড়ি ও প্রাঙ্গন, নয়নাভিরাম আলপনায় সজ্জিত। প্রতিটা বাড়ির সামনে সুসজ্জিত তুলসীমঞ্চ। অবাক কাণ্ড, কোনও তুলসীতলাতেই প্রদীপ জ্বলছে না। গঙ্গানগরের মানুষগুলোর হলটা কী? দূর থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের একটানা গুরুগম্ভীর গর্জন। বাতাসে লোনা গন্ধ। হঠাৎ তার সঙ্গেই ভেসে এল ক্ষীণ এক আর্ত চিৎকার। নাকি কোনও রাতচরা পাখির ডাক? আবার এল শব্দটা। এবার আরও স্পষ্ট। দুর্গা দেখল, চিঙ্কাও শুনতে পেয়েছে, কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আবার শোনা গেল। পাখির ডাক নয়, নারীকণ্ঠের আর্তচিৎকার। ‘চল চিঙ্কা’। বাহনের পিঠ থাবড়ে দিল দুর্গা। বিরাট একটা লাফ দিয়ে শব্দের উৎসের দিকে দৌড়লো চিঙ্কা।

সরু নখের মতো একফালি চাঁদ উঠেছে আকাশে। সেই ক্ষীণ আলোয় দেখতে পেল দুর্গা, দূরে একটা বাড়ির সামনের বাশের বেড়া ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে একপাশে। সে বেড়ার ওপারে বেশ কিছু জমাট-বাঁধা অন্ধকার ইতস্তত নড়াচড়া করছে। আর্তনাদের উৎস ওই জায়গাটাই। আরেকটু কাছে যেতেই দুর্গা দেখতে গেল, চার-পাঁচটা মাথা, মোষের করোটির শিরস্ত্রাণে ঢাকা। মাটিতে কিছু একটা পড়ে আছে, সবাই মিলে

With Best Complements From

AN ISO-9001
CERTIFIED
COMPANY

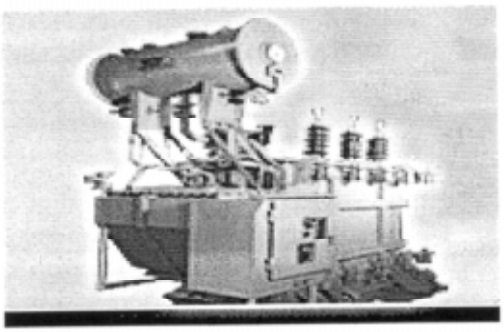

EIU EIU

East India Udyog Limited

145, G.T. ROAD, SAHIBABAD
GHAZIABAD - 210 005 (UP)

Phone : [0120] 4105890
e-mail : eiulgbd@vsnl.com
eiulgbd@rediffmail.com
URL : www.eastindiaudyog.com

Manufacturers of :
"ETS" MAKE POWER & DISTRIBUTION
TRANSFORMERS UPTO 15 MVA & 33 KV CLASS

ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর। কী ওটা? মাটিতে একটা নারীর অবয়ব। সে অবয়বের হাত-পা চেপে ধরে আছে লোকগুলো। একটা মোষ-মুকুট লোক উপুড় হয়ে শুয়ে আছে মেয়েটির ওপর। ছটফট করছে, যন্ত্রণায় চিৎকার করছে মেয়েটি। মুহূর্তে যেন আগুন জ্বলে উঠলো দুর্গার মাথায়। 'অ্যা-ই-ই-ই-ই-ই!' হুঙ্কারে রাত্রির স্থবিরতা খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল। লোকগুলো চমকে উঠে দাঁড়ালো। 'খবরদার!' আবার হুঙ্কার দিল দুর্গা, হাতে উদ্যত খড়্গ। জবাবে সাঁই করে উড়ে এল একটা তরোয়াল। দুর্গার খড়্গের আঘাতে আকাশেই দু-টুকরো হলো সেটা। চিঙ্কা গর্জে উঠল কান-ফাটানো শব্দে। বিরাট এক লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকগুলোর ওপর। এর পরের কয়েক মুহূর্ত শুধু শোনা গেল তলোয়ারে-খড়্গে ধাতব টঙ্কার ও পুরুষ-কণ্ঠের আর্তনাদ। যেন ঝড় বয়ে গেল জায়গাটার ওপর দিয়ে। উপড়ে পড়লো গাছপালা, ভেঙ্গে পড়লো তুলসীমঞ্চ। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবকটা লোক রক্তাক্ত কলেবরে ভূমি-শয়ন নিল। 'উম্মমমমহ!' চিঙ্কার গর্জনে কেঁপে উঠল মাটি।

'জল... জল...' কাতর আর্তনাদ শুনে তাকিয়ে দেখল দুর্গা, মাটিতে পড়ে আছে ওরই বয়সী একটি মেয়ে। পরনের জামাকাপড় নরপশুদের হিংস্রতার আগুনে ঝলসে ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে। সারা শরীর রক্তে মাখামাখি— নখদাঁতের হিংস্র লালসার অত্যাচার দেহটাকে দুমড়ে থেঁতলে দিয়েছে। চিঙ্কার পিঠে বাঁধা জলের থলিটা টেনে নামিয়ে আনলো দুর্গা। থলিটা খালি। কী হবে এখন? জল কোথায় পাই? ওই তো, সামনের বাড়িটার জানালার আধভেজানো কবাটের পেছন থেকে কে যেন উঁকি মারছে। দুর্গা দৌড়ে গেল সেদিকে। লাফিয়ে দেউড়িতে উঠে জানালার কাছে গিয়ে বলল, 'শুনছেন? একটু জল চাই। আর একজন বৈদ্য।'

জানালা সজোরে বন্ধ করে দিল বাড়ির ভেতরের লোকটা।

অবাক দুর্গা ধাক্কা দিল জানালায়। 'দরজা খুলুন। একটু সাহায্য দরকার।'

'দয়া করে এখান থেকে চলে যাও।' ভেতরের লোকটা বলল।

'কী বলছেন আপনি! এভাবে পড়ে থাকলে মেয়েটা যে মরে যাবে।'

'ও তো এমনিই মরে গেছে। মহিষের লোকেদের সঙ্গে শত্রুতা করেছ, তুমিও মরবে। আমি সামান্য গৃহস্থ, আমাকে এর মধ্যে টেনে এনো না। বউ-বাচ্চা নিয়ে ঘর করতে হয় আমাকে।'

'কাপুরুষ!' রাগে বাড়ির দেওয়ালে সজোরে একটা লাথি মারল দুর্গা।

না, মাথা গরম করে লাভ নেই। দেউড়ি থেকে নেমে দুর্গা মেয়েটির কাছে গেল, কোলে তুলে নিল দেহটাকে। লাফিয়ে উঠলো চিঙ্কার পিঠে। 'চল চিঙ্কা!' দুর্গার ইঙ্গিতে চিঙ্কা দৌড়লো সমুদ্রের অভিমুখে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সামনে দেখা দিল সমুদ্রতীর। পাহাড়ের মেয়ে ও, এই প্রথম সমুদ্র দেখল। অন্ধকার মাটিতে তিনদিক থেকে ঘিরে রেখেছে অনন্ত জলধি, সবুজ থাকব রসায়নে ভাস্বর। সাদা ফেনার স্রোত দিগন্ত থেকে ধেয়ে আসছে বারবার। তীরভূমি ছুঁয়ে ফেলার আগেই কোনও এক অদৃশ্য খড়্গের আঘাতে ভেঙে সহস্রধারায় ছড়িয়ে পড়ছে ভূবলয় জুড়ে। না, এসব দেখে মুগ্ধ হবার সময় নেই এখন। মেয়েটির শরীর থেকে বয়ে যাওয়া রক্তে ভেসে যাচ্ছে ওর হাতদুটো, ভেসে যাচ্ছে চিঙ্কার পিঠ। নেতিয়ে পড়েছে মেয়েটি, বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ওই তো, দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রতীর থেকে একটু দূরে বাঁশের বেড়ায় ঘেরা অনেকখানি জায়গা জুড়ে তপোবন। ওটাই সম্ভবত অক্ষুমুনির আশ্রম। দুর্গার ইশারায় চিঙ্কা ছুটলো সেইদিকে। বেড়া পেরোতেই সামনে পড়ল একটা চারচালা বাড়ি। তার সামনে এসে দুর্গা চিঙ্কার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল, কোলে মেয়েটির দেহ। পা দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, 'শুনছেন, একটু দরজা খুলবেন?'

দরজা খুলে গেল। সামনে সৌম্যদর্শন একজন বৃদ্ধ। সাদা লম্বা চুল, লম্বা সাদা দাড়ি। তাঁর ঠিক পেছনে একজন বৃদ্ধা, তাঁরও চুল সব সাদা। অচৈতন্য দেহটা কোলে দুর্গা দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

'মেয়েটার আঘাত খুব গুরুতর। একটু দেখবেন ওকে?' মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলল দুর্গা।

শুভ্রকেশ সেই মহিলা স্খলিত পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন দুর্গার দিকে। কোলের মেয়েটির মুখ দেখেই চিৎকার করে উঠলেন, 'মৃন্ময়ী-ই-ই-ই-ই।'

বাড়ির ভেতর থেকে দৌড়ে এল অল্পবয়স্কা একটি মেয়ে। বয়সে দুর্গার থেকে অনেকটাই ছোট। চিতাবাঘের মতো ঋজু, দৃঢ় গড়ন, চকচকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গায়ের রঙ। একঢাল কালো কোঁকড়ানো চুল পিঠ গড়িয়ে কোমরে নেমেছে। সফরীসদৃশ দীঘল কাজলকালো চোখদুটো, মুখময় ছড়িয়ে রয়েছে স্বর্গীয় লাবণ্য। হাত বাড়িয়ে মৃন্ময়ীর দেহটা কোলে তুলে নিল অবলীলাক্রমে। বোঝা গেল, ছিপছিপে ওই শরীর অসীম শক্তি ধরে। বাড়ির ভেতরে ঢুকে খুব সাবধানে দেহটাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। পেছন পেছন দুর্গাও বাড়ির ভেতরে ঢুকলো।

'তোমার নাম কী ভাই?' জিজ্ঞেস করল দুর্গা।

'আমার নাম কালী।' বলল মেয়েটি, 'আর তোমার?'

সুদীর্ঘ এক অন্ধ রজনীর শেষলগ্নে মৃন্ময়ী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

নরপশুগুলো দেহটার ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালিয়েছে। ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে শরীরটাকে, শস্ত্রাঘাতে শরীরের অভ্যন্তরও ক্ষতবিক্ষত করে রেখেছে। বৈদ্য সারারাত চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারল না মৃন্ময়ীকে। গাছতলায় চুপটি করে বসেছিল চিঙ্কা। দুর্গাকে উঠোন থেকে নামতে দেখে মুখ ফিরিয়ে তাকালো ওর দিকে। দুর্গা এগিয়ে গিয়ে চিঙ্কার গলা জড়িয়ে ধরল। চিঙ্কা খুব আলতো করে ওর মাথা ঘঁষলো দুর্গার কাঁধে। চেটে দিল দুর্গার হাতের তালু। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল দুর্গা, এক এক করে তারারা মুছে যাচ্ছে আকাশ থেকে। সে আকাশের নিচে নিথর ধরিত্রী যেন জমাটবাঁধা অন্ধকার। যেন পাপের পাহাড়। সামনে ফেনায়িত অপার্থিব দামাল সমুদ্র। দু'ধারে কৃষ্ণাঙ্গী নিবিড় বনানীতে মাতৃগর্ভের অমানিশা। মাঝে বালিয়াড়িতে দাঁড়িয়ে দুর্গা। এ যেন সভ্যতার উষালগ্নের পূর্বরাত্রি। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল দুর্গা, 'মানুষ কী করে এত খারাপ হয় বলতো চিঙ্কা?'

কিছুক্ষণের মধ্যে আকাশের পূর্ব কোণে রাঙা রঙের ছোঁয়া লাগলো। পাখির ডাক শোনা গেল ইতিউতি। কয়েকজন আশ্রম-বালিকা বেরিয়ে এল কুটির থেকে। তারা শিউরে উঠল চিঙ্কাকে দেখে।

'কী এটা?' ভয়ে ভয়ে বলল একটি মেয়ে।

'চিঙ্কা হল বাংহ', বলল দুর্গা, 'ওর বাবা বাঘ, মা সিংহ।'

'এরকমটা আবার হয় নাকি?' মেয়েটির গলায় অবিশ্বাস।

'হয়', বলল দুর্গা, 'আমার গ্রামের লোকেরা বলে, চিঙ্কা হল 'ঘোড়াদাবা সিংহ'। ঘোড়ার মতো দৌড়তে পারে, বাঘ-সিংহর মতো যুদ্ধও করতে পারে।'

সাদা-দাড়ি বৃদ্ধ বললেন, 'কে তুমি মা? এখানে কী করে এলে?'

দুর্গা দেখল, সমুদ্রের রং কালো থেকে হয়েছে ঘন লাল। যেন সমুদ্র ভিজে আছে রক্ত। চিঙ্কার পিঠের থলি থেকে পাঠশালার গুরুমশাইয়ের চিঠিটা বার করে বৃদ্ধর হাতে দিল দুর্গা।

'তুমি ঠিক জায়গাতেই এসেছ মা', চিঠি পড়ে বলল বৃদ্ধ, 'কিন্তু এসেছ ভুল সময়ে।'

'আপনিই কি অক্ষুমুনি?'

'হ্যাঁ। এই গুরুকুলের আমি প্রধান আচার্য।'

'কেন বলছেন, ভুল সময়ে এসেছি?'

'এ রাজ্যে এখন আর কেউ নিরাপদ নয়, বিশেষ করে মেয়েরা। তার ওপর নতুন রাজা মেয়েদের লেখাপড়া করা পছন্দ করেন না। গুরুকুলের ছাত্রীদের ভয় দেখাতে সৈন্যদের ছেড়ে দিচ্ছেন তাদের ওপর। আমি ঠিক করে ফেলেছি, এ গুরুকুল বন্ধ করে দেব।'

'নতুন রাজা কেন? মহারাজ অমিতবলের কী হল?'

'তুমি দেখছি জানো না। গত মাসে গঙ্গানগরের পতন হয়েছে। মহারাজ খুন হয়েছেন।'

'সেকি! মহারাজ অমিতবলের এতবড় সেনাবাহিনী, কে তাঁকে হারালো?'

'তার নাম মহিষ। সেই এখন এই রাজ্যের শাসক।'

'একটা লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার,' বলল দুর্গা, 'গঙ্গা পার হওয়ার সময়। সে আমাকে বলছিল, এরাজ্যে নাকি অসু ছাড়া আর কারোর উপাসনা করা নিষেধ। সে বলেছিল, এটা নাকি মহিষাসুরের আইন।'

'তুমি ঠিকই শুনেছ।'

'কে এই মহিষ? কেন সে জোর করে অসুর উপাসনা সবার উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে?' বলল দুর্গা

'মা, দেবাসুরের দ্বন্দ্বের ব্যাপারে তুমি কী জানো?'

'আমি দুর্গম পাহাড়ের মেয়ে, সমতলের রাজনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ,' বলল দুর্গা, 'এটুকু শুধু শুনেছি— দেব ও অসুর, ভিন্ন উপাসনা পদ্ধতিতে বিশ্বাসী দুই সম্প্রদায় বহুকাল ধরে লড়াই চালিয়ে আসছে, এই জম্বুদ্বীপে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। দেবতারা সূর্য, অগ্নি, বরুণ, বজ্র, পবন ইত্যাদি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। অসুরদের মধ্যেও দুটি গোষ্ঠী আছে, দৈত্য ও দানব। এছাড়া বিস্তারিত আর কিছু জানি না।'

'তবে বসো এখানে। সব বলব তোমায়। বললে মনের ভারও কিছুটা লাঘব হবে।'

দুর্গা দেখল, একটা কমলা গোলক ধীরে ধীরে জল ছেড়ে আকাশে ভেসে উঠছে। যত সে ওপরে উঠছে, রং বদলাচ্ছে তার। সমুদ্রেরও রং বদলাচ্ছে তার সঙ্গে। ভোরের বাতাসে নতুন দিনের গন্ধ।

'গোড়া থেকেই বলি মা, শোনো', শুরু করলেন অক্ষুমুনি, 'হিমালয়-কিরিটী সমুদ্র-মেখলা এই জম্বুদ্বীপের ওপর প্রকৃতির অপার স্নেহ। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে অপর্যাপ্ত বৃষ্টি হয়। অসংখ্য নদী ও তাদের শাখাপ্রশাখা এদেশের মাটিকে পুষ্ট করেছে।

চাষাবাদ বা পশুপালনের জন্য খুব বেশি কষ্ট করতে হয় না। তাই এদেশের মানুষ কল্পনাপ্রবণ, ভাবুক। এদেশকে 'ভা-রত' অর্থাৎ 'জ্ঞানে রত' বলা হয়, তা অর্থহীন নয়। কে আমি, কীভাবে এখানে এলাম, কী রহস্য এ প্রকৃতির, কে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, এসব প্রশ্ন মানষকে সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই ভাবিয়ে এসেছে। এদেশের মানুষরা তাদের অখণ্ড অবসর, তাদের বুদ্ধি, যুক্তি ও কল্পনা দিয়ে সেইসব প্রশ্নের নানা উত্তর পেয়েছে। তাই এদেশে অসংখ্য সম্প্রদায়, অসংখ্য মতবাদ।

পুরাকালে কাশ্যপ মুনি বলেছিলেন, এ জগতে যত শক্তি আছে, সবই একমেবদ্বিতীয়ম এ মহাশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। সেই মহাশক্তির তিনি নাম দিয়েছিলেন 'ঈশ্'। এক মতান্তরে 'অস্'। এই নিয়ে গোলমাল বাধলো কাশ্যপ মুনির সন্তানদের মধ্যে। তুমি বোধহয় শুনেছ কাশ্যপ মুনির তিন পত্নীর কথা— দিতি, অদিতি ও ধনু। তিনজনেই প্রগাঢ় জ্ঞানী ও ব্যক্তিত্বময়ী। দিতির সন্তানরা দৈত্য, দনুর সন্তানরা দানব, অদিতির সন্তানরা আদিত্য। দৈত্যরা বলল, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে অনাচার চলছে। কেউ পুজো করছে আগুনের, কেউ জলের, কেউ গাছের, কেউ বা পাথরের। এসব অনাচার বন্ধ করতে হবে। কাশ্যপ মুনির বর্ণনার মহাশক্তি 'অস্'। যাকে দৈত্যরা বলত 'অসু', সারা দেশ জুড়ে শুধু তারই উপাসনা বলবৎ করতে হবে। দানবরাও এই মতেরই সমর্থক হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু বেঁকে বসল আদিত্যরা। তারা বলল, প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা বা মূর্তিপূজা অনাচার নয়। সত্য এক, কিন্তু তার প্রকাশ বিভিন্ন। সেই সত্যকে একটি বিশেষ নাম দিয়ে এক বিশেষ উপাসনা-পদ্ধতি সমস্ত দেশবাসীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়। যেমন এক মাপের জামা সকলের পরিধেয় হতে পারে না, তেমনই একই উপাসনা পদ্ধতি সমস্ত জাতির উপযুক্ত হতে পারে না। সে চেষ্টা করলে জাতির আধ্যাত্মিক চেতনার পতনই শুধু সুনিশ্চিত করা হবে। কাশ্যপ মুনির বর্ণনার 'ঈশ্', যাকে আদিত্যরা বলতো 'ঈশ্বর', তাঁকে এক মেনেও প্রত্যেকের স্বাধীনতা থাকতে হবে ভিন্ন ভিন্ন 'দেব'-এর, অর্থাৎ শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে উপাসনার করার। ভক্ত যেমন, ঈশ্বরও তেমন। প্রত্যেককে নিজের রুচিমতো এগোতে দিতে হবে, তাতেই জনগণের সর্বাধিক আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে।

যুক্তি হিসেবে অসু-মতবাদ জোরালো। ব্রহ্মাণ্ডের একটাই শক্তি, সেটাই তো যুক্তিযুক্ত। বিদগ্ধ মহলে অসু-মতবাদ তাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু প্রকৃতি-নির্ভর গ্রামীণ ও বনবাসীদের কাছে প্রাকৃতিক শক্তির রূপে ঈশ্বরের আরাধনাই স্বাভাবিক। সে অধিকার কেড়ে নিতে গেলে সংঘর্ষ অনিবার্য। কালক্রমে দেখা গেল, দেশের অর্ধেক মানুষ অসু-মতবাদী, চাইছে গোটা দেশের ওপর অসু-উপাসনা চাপিয়ে দিতে। বাকি অর্ধেক দেব-মতবাদী, চাইছে এদেশের প্রাচীন প্রকৃতি-পূজার পরম্পরা বজায় রাখতে। এই নিয়েই দ্বন্দ্ব।'

'আপনি কোন মতকে ঠিক বলে মনে করেন?'

'দ্যাখো মা, বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে আলাদা আলাদা ভাবে দেখাকে আমি যুক্তিযুক্ত মনে করতে পারি না,' বললেন অক্ষুমুনি, 'তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে অসু-উপাসক। কিন্তু আধুনিক অসু-মতবাদীদের সঙ্গেও আমি পুরোপুরি একমত হতে পারি না। তারা বলে এই ব্রহ্মাণ্ডের অসুই একমাত্র প্রভু। সূর্য, চন্দ্র, তারকারাশি, অগ্নি, জল, বায়ু— এরা সবাই অসুর দাস। অসু যেমন আদেশ দেন, এরা তেমনটিই করে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কীভাবে প্রযোজ্য হবে? কে তাদের বলে দেবে, মানবজাতির জন্য অসুর কী নির্দেশ? তখন মহিষের মতো ঠগবাজ কেউ এসে জোটে। সে এসে বলে, সে যা বলছে, সেটাই অসুর নির্দেশ। পৃথিবীসুদ্ধু সবাইকে সেটাই মানতে হবে। এর মাধ্যমে জনগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না, শাসক দ্বারা সমাজ উৎপীড়নের পথই শুধু প্রশস্ত হয়। তাছাড়া, আমি তো প্রকৃতির সব শক্তির মধ্যেই অসুকে দেখতে পাই। প্রতিটি শক্তির কাছ থেকেই আধ্যাত্মিক প্রেরণা পাই। কোনও দেব-মতবাদী যদি আগুনের পূজা করে, তবে তার মাধ্যমে তো সে সেই অসুরই পূজা করছে, তাই না? আগুনকে 'দাস' বলে অশ্রদ্ধা করার থেকে তা বহুগুণে ভালো।'

'ক্ষমা করবেন, আমি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে ফেললাম,' বলল দুর্গা 'আপনি এবার মহিষের কথা বলুন।'

'মহিষের পিতা রম্ভ ছিল দনুর পুত্র,' বললেন অক্ষুমুনি, 'সে প্রেমে পড়ল মহিষপালক এক উপজাতি প্রধানের কন্যার। এই উপজাতির তত্ত্বাবধানে আছে প্রায় পাঁচলক্ষ মোষ। সেই মোষেদের চারণভূমি উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এই উপজাতির দখলে। মহিষ তার পিতার সূত্রে পেয়েছে উন্নত যুদ্ধবিদ্যা ও রাজনীতি-বিদ্যার শিক্ষা, জেষ্ঠ্যতাত দৈত্যদের সূত্রে পেয়েছে অন্ধ অসু-ভক্তি। মাতার সূত্রে পেয়েছে পাঁচ লক্ষ মোষ, মহিষপালক সমাজের নেতৃত্ব, আর পেয়েছে বিশাল এক ভূমিখণ্ডের মালিকানা। অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর তপস্যায় সেই মোষেদের ও মোষপালকদের সে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করে তুলেছে। ভারতে যুদ্ধের প্রধান বাহন ঘোড়া। কল্পনা করতে পারো, আক্রমণোদ্যত মোষকে দেখলে ঘোড়ার কী হাল হতে পারে? ঝটিকা আক্রমণে সমগ্র উত্তর ভারত জয় করে ফেলেছে মহিষ। সেখানকার প্রত্যেক প্রকৃতি-উপাসক উপজাতি, অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু, জল আদি প্রতিটি 'দেব' মহিষের শক্তির সামনে পরাজয় স্বীকার করেছে। অর্ধেক ভারতের অধীশ্বর হয়ে মহিষ

An ISO 9001 : 2008
certified Company

With Best
Compliments From :-

SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

FOR ANY TYPE OF PILE FOUNDATION WORK

CAST-IN-SITU DRIVEN, CAST-IN-SITU BORED, PRECAST DRIVEN, PRECAST PRE-BOARD, STEEL OR R.C.C. SHEET PILES ETC

AND

ALL TYPES OF ENGINEERING AND CONSTRUCTION WORKS FOR CIVIL, STRUCTURAL, MARINE, TANKAGES, PIPING EQUIPMENT ERECTION IN

Power Station, Road Projects, Fertilizer Projects, Cement Plants, Refinery Construction, Coal Handling Plants,Paper Mills, R.C.C. or Prestressed Concrete Bridges, Fabrication & Erection of Steel Structures, Hydrocarbon Storage Tanks and Pipeline, Cross-Country Pipeline, Steel Plant Construction, Multi-storied Building, Micro-Tunneling, Box/Pipe Pushing, HDD, High-rise Silo Structures By Slipform Technique,Bunkers, Jetties, Marine Structures, Deep Underground Basement, Textile factories, Effluent Treatment Plant, Water & Sewage Treatment Plant Etc., as Well as Turnkey Construction And for any other type of Industrial and Utility Projects For Economy, Speed and Quality Construction.

CONTACT :

SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

Foundation, Reinforced & Prestressed Concrete Specialist

REGD. OFFICE
"Simplex House"
27, Shakespeare Sarani, Kolkata – 700017
Phone :- (033) 2301 1600
Fax :- (033)2283 5964/65/66
E-mail :- simplexkolkata@simplexinfra.com
Web :- www.simplexinfrastructures.com

ADM. OFFICE
12/1, Nellie Sengupta Sarani
Kolkata – 700087
Phone :- (033)2252 8371/8373/8374
Fax :- (033) 2252 7595

BRANCHES

NEW DELHI **MUMBAI** **CHENNAI**

'মহিষাসুর' নাম নিয়েছে। সে নিজেই অসুর প্রতিরূপ, তার নির্দেশই অসুর ইচ্ছা, এমনটিই সে লোকমধ্যে প্রচার চালাচ্ছে।'

'উত্তর ভারত জয় করল মহিষ', জিজ্ঞেস করল দুর্গা, 'আর দক্ষিণ ভারত?'

'বিন্ধ্য পর্বতের উপজাতিরা আপাতত মহিষের অগ্রগতি রোধ করে দিয়েছে।'

'কী করে?' জিজ্ঞেস করল দুর্গা।

'মোষ যতই শিক্ষিত হোক না কেন, পাহাড় ডিঙোতে সে ঘোড়ার মতো পটু নয়। তাছাড়া দক্ষিণের রাজাদের হাতি আছে। হাতি তো আর মোষকে ভয় পায় না।'

'দক্ষিণে হেরে গিয়ে এখন মহিষের নজর পড়েছে পূর্বদিকে?'

'কতকটা তাই।' বললেন অক্ষুমুনি, 'মহিষ তার উত্থানের সময় দেশজুড়ে অসু-উপাসকদের সমর্থন পেয়েছিল। কিন্তু নিজেকে অসুর প্রতিভূ ঘোষণা করার পর থেকেই সেই সমর্থকদের একটি বড় অংশ উপলব্ধি করেছে, মহিষাসুরের অসু-ভক্তি আদতে লোকদেখানো। অসু-মতবাদের নাম করে সে গোটা দেশটাকে নিজের পদানত করতে চাইছে। মহিষের সিংহাসন টলে উঠল প্রজা-বিদ্রোহের ভয়ে। অসুবাদীদের সমর্থন ফিরে পেতে সে তখন দু'হাত ভরে স্বর্ণমুদ্রা ছড়াতে শুরু করল। ঘুষ দিয়ে কিনে নিতে শুরু করল অসু-ধর্মগুরুদের। এমন অবস্থা কি বেশিদিন চলতে পারে? কিছুদিনের মধ্যেই সাম্রাজ্যের অর্থকোষে টান পড়ল।'

'আর তাই মহিষের নজর পড়ল এদিকে?' বলল দুর্গা।

'ঠিক তাই। সবাই জানে, সারা পৃথিবীতে যত সোনা আছে, তার অর্ধেক আছে এই ব্রহ্মারাজ্যে।'

'কিন্তু মহিষাসুর এরাজ্য জয় করল কী করে?' প্রশ্ন দুর্গার, 'ব্রহ্মারাজের তো এক লক্ষ হাতি ছিল!'

'মোষ-বাহিনী দিয়ে নয়,' অক্ষুমুনি বললেন, 'শঠতা দিয়ে ব্রহ্মা জয় করেছে মহিষ।'

ধীরে ধীরে আকাশের লালে লাগলো সোনার ছটা, দিগ্বলয়ে বান ডাকলো গেরুয়া রঙের। আশ্রমবালিকারা সবাই একে একে এসে অক্ষুমুনি ও দুর্গাকে ঘিরে বসেছে। তাদেরই একজন একটা পিতলের ঘটি এগিয়ে দিল অক্ষুমুনির দিকে। তা থেকে ঢক্‌ঢক্ করে খানিকটা জল খেয়ে অক্ষুমুনি আবার বলতে শুরু করলেন—

'মহারাজ মহীবল ছিলেন পরাক্রমশালী রাজা, আমার বিশেষ বন্ধু। আমার মতো অনেকেই ছিল তাঁর গুণমুগ্ধ। কিন্তু তাঁর পুত্র অমিতবল ছিলেন ভোগী ও অযোগ্য। তিনি সিংহাসনে বসার পর থেকে গঙ্গানগরের ক্রমাগত অধোগতিই হয়েছে। বেতন ও পদোন্নতি থেকে শুরু করে নানান বিষয় নিয়ে সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ জমেছে। জোর করে বর্ধিত হারে কর আদায় করতে গিয়ে বহু ব্যবসায়ীকে চটিয়েছেন তিনি, তাদের অনেকেই নিজেদের ব্যবসা এখান থেকে গুটিয়ে নিয়ে লোথাল বা করাচপায় চলে গেছে। অমিতবলের এসব দিকে বিশেষ কোনও নজর ছিল না। ইতিমধ্যে অলতু নামক এক জনপদের প্রজারা বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে রাজপথ অবরোধ করল। সেই সমস্যাও অমিতবল সময়মতো সামলাতে পারলেন না। প্রজারা ক্ষেপে উঠল রাজার উপর। রাজার তাতেও হুঁশ ফিরল না। সম্প্রতি তিনি কাশ্যপমীর থেকে হিরণ্যলোম এক বারবণিতাকে নিয়ে এসেছিলেন। সে নাকি অপূর্ব সুন্দরী। এবং অসুর-বংশীয়। সারাক্ষণ তাকে নিয়েই মত্ত ছিলেন রাজা। রাজপ্রাসাদে সেই বারবণিতার আগমন-নির্গমন প্রজাদের থেকে গোপন রাখতে প্রাসাদের খিড়কির ঘাটের প্রহরা সরিয়ে নেন উনি। মহিষের কানে এই খবর পৌঁছায়। এক রাত্রে মাত্র বাইশজন বিশ্বস্ত সৈন্য নিয়ে চুপিসারে নৌকা করে রাজপ্রাসাদের খিড়কির ঘাটে পৌঁছায় সে। অরক্ষিত খিড়কির দরজা দিয়ে রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়ে।'

'অবিশ্বাস্য! বারবণিতার মোহে রাজদ্বার অরক্ষিত রাখা, এমনটা কী করে কোনও রাজা করতে পারে!' বলল দুর্গা।

'রাজা কী করে, তার অনেকটাই নির্ভর করে রাজার পরামর্শদাতাদের ওপর। মতিভ্রান্ত অমিতবল পরামর্শদাতা হিসাবে ভরসা করতেন তাঁর জ্যোতিষীদের ওপর। শোনা যাচ্ছে, সেই জ্যোতিষীরা বহুদিন থেকেই গোপনে মহিষের উৎকোচভোগী। মহিষ যেমন চেয়েছে, তেমন করেই তারা অমিতবলকে পরিচালিত করেছে।'

'তারপর কী হলো?'

'মহিষের আক্রমণের সংবাদ রাজ-চরেরা দ্রুত পৌঁছে দিয়েছিল বন্দরে প্রতীক্ষারত সেনাবাহিনীর কাছে। কিন্তু পথ-অবরোধের কারণে সেনাবাহিনী সময়মতো রাজপ্রাসাদে পৌঁছাতে পারল না। ইতিমধ্যে ঝটিকা আক্রমণে মহিষ দখল করে নিল রাজপ্রাসাদ। মহারাজ অমিতবল খুন হলেন সে রাতে। মহিষ সিংহাসনে আরোহণ করল। মহারাজের ভগিনী রাজদুহিতা মায়াবলীকে বিবাহ করেছে মহিষ, মায়াবলী তার

পিতৃদত্ত নাম ত্যাগ করে 'মহিষী' নাম গ্রহণ করেছে। সবচেয়ে নক্কারজনক কাজ সেটি করেছে মহিষ, সেটি হল, রাজপ্রাসাদের প্রতিটি নারীকে বলপূর্বক যৌনদাসী বানিয়েছে। এমনকি রাজপুত্রদেরও নপুংসক বানিয়ে নিজের যৌনসেবার কাজে লাগিয়েছে। শুধুমাত্র ছোটো রাজকুমার দিব্যবল পালিয়ে বেঁচেছে।'

গা গুলিয়ে উঠল দুর্গার। 'এমন ঘৃণ্য কাজ, মহিষের সঙ্গীসাথীরা মেনে নিল কী করে?'

'মহিষ ফরমান জারি করেছে— বিধর্মীদের, বিশেষত বিধর্মী নারীদের ধর্ষণ ও সম্ভোগ নাকি পুণ্যের কাজ। সেটিই নাকি অসু-র নির্দেশ। বিধর্মীদের যত যন্ত্রণা দেওয়া যায়, ততই নাকি অসু খুশি হন। মহিষের অনুগামীরা মহিষের কথাকেই অসু-বাক্য বলে বিশ্বাস করে। আর তাই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে নারীধর্ষণ, অত্যাচার, অপহরণ ও হত্যা—' বলতে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন অক্ষুমুনি।

'এরকম নারকীয় উদ্দেশ্য?' বলল স্তম্ভিত দুর্গা।

'কেউ তো আর শখ করে মহিষের সৈন্যদলে যোগ দেয় না। যেখানে যত পিশাচ স্বভাবের ধর্ষকামী আছে, তাদের এইসব লোভ দেখিয়ে নিজের সৈন্যদল স্ফীত করেছে মহিষ।'

'রাজ্যে এতসব ঘৃণ্য ঘটনা ঘটছে, আর প্রজারা বিদ্রোহ করছে না? ব্রহ্মার সৈন্যরাই বা কী করে মহিষকে রাজা বলে মেনে নিল?' দুর্গার চোখে বিস্ময়।

'প্রজারা বা সৈন্যরা মহারাজ অমিতবলের ওপর মোটেই খুশি ছিল না। তাই তাঁর পরাজয়। তারা একরকম নিরাসক্ত মন দিয়েই দূর থেকে দেখেছে। ভাবখানা এমন— সব রাজাই খারাপ, তাই কে রাজা হল তাতে কী আসে যায়? তার ওপর মহিষের উৎকোচভোগী জ্যোতিষীর দল রাজ্যে প্রচার চালাচ্ছে— মহিষ সর্বশক্তিমান, ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, সেই একমাত্র আরাধ্য। মাতৃ উপাসনার যুগ শেষ, এটা এখন অসুর যুগ, মহিষাসুরের যুগ। প্রজারা তা বিশ্বাসও করছে। এটা তো সত্যি, যে দেবতারা একে একে পরাভূত হয়েছেন মহিষের কাছে। শোনা যাচ্ছে, মহাদেব ও বিষ্ণুও চেষ্টা করে মহিষকে হারাতে পারেননি। প্রজারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, মহিষ সত্যিই অসু-র প্রতিভূ। কেউ তাকে হারাতে পারবে না। রাজভগিনীর মহিষের পক্ষে যোগদান সেই ভাবনাকেই পুষ্ট করেছে। দুঃখের কথা কি জানো মা, কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষে ভেদ ছিল না কখনও এদেশে। আর আজ নারীসমাজ গৃহকোণে সীমাবদ্ধ হয়ে রয়ে যাচ্ছে। অঙ্গনের বাইরে পা রাখা তার পক্ষে নিরাপদ নয় আর। এমতবস্থায় এই গুরুকুল চালিয়ে লাভ কী?'

'না, এ চলতে পারে না।' মাথা নেড়ে বলল দুর্গা, 'আমি গ্রামের মেয়ে, শহুরে রাজনীতি আমি অতশত বুঝি না। শুধু এটুকু বুঝি, এ মাৎস্যন্যায়ের প্রতিকার না করতে পারলে জীবন বৃথা। এই শহরে আমি এসেছিলাম লেখাপড়া করতে। কিন্তু যেখানে নারীর মূল্য এরকম কানাকড়ি, সেখানে লেখাপড়া করে কী হবে? আজ এই আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, মহিষাসুরকে এ পবিত্র ব্রহ্মাভূমি থেকে উচ্ছেদ করে তবেই আমি আবার পুঁথিতে হাত দেব, তার আগে নয়।'

'আমি তোমার সঙ্গে একমত,' মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে থেকে বলে উঠল কেউ, 'এখন কী করবে, সেটা বলো।'

'কে তুমি ভাই?' পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করল দুর্গা।

'আমার নাম ভুবনেশ্বরী,' আশ্রমবালিকাদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

ভালো করে তাকিয়ে দেখল দুর্গা। ওর থেকে কয়েক বছরের বড়ই হবে মেয়েটি। লম্বা গড়ন, স্বর্ণাভ গাত্রবর্ণ। নীল চোখে মহাশূন্যের গভীরতা।

'আমি ভুবনেশ্বরী', আবার বলল মেয়েটি, 'তুমি একা এতগুলো মহিষ সৈন্যকে হারিয়েছ, সাধারণ মেয়ে নও তুমি। আমার মন বলছে, পারলে তুমিই কিছু করতে পারবে। তোমার কথায় ভরসা করতে ইচ্ছে করছে। এ শহরের সবাইকে আমি চিনি। কী তোমার পরিকল্পনা বলো। বিদ্রোহের জন্য কীরকম লোকজন লাগবে, বলো। লোক সংগ্রহের ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

গতরাতের আলাপ হওয়া মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। দুর্গা দেখল, মেয়েটির কান্নাভেজা কাজলকালো চোখদুটো জিঘাংসায় জ্বলজ্বল করছে। 'আমিও তোমাদের সঙ্গে আছি,' বলল কালী, 'প্রতিজ্ঞা করছি, আগে অসুরদের রক্তপান করব, তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস নেব।'

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখল দুর্গা। মনে হল, সূর্যদেব তাঁর ভাণ্ডারের সব সোনা গলিয়ে সমুদ্রে ঢেলে দিয়েছেন। দিগন্ত পর্যন্ত থৈ থৈ করছে তরল সোনা।

মৃন্ময়ীর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হল সমুদ্রতীরে।

তার পরের কয়েকটা দিন দুর্গা, ভুবনেশ্বরী ও কালী তিনজনে মিলে গঙ্গানগরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ালো। শহরের কোথায় কত সেনা মোতায়েন রয়েছে, কোন ছাউনিতে

কত সৈন্য আছে, রাজপ্রাসাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কীরকম, সেসব বিস্তারে নথিবদ্ধ করল। দুর্গা দেখল, বড় কঠিন ঠাঁই এই গঙ্গানগর। গোটা শহরটাই তৈরি হয়েছে ভয়ানক দুর্গম এক জঙ্গলের ঠিক মধ্যিখানে। সে জঙ্গলের জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। মহিষের আগে আর কোনও বহিঃশত্রু গঙ্গানগর জয় করতে পারেনি, তার একটা কারণ বোধহয় এটাও। রাজপ্রাসাদের খিড়কির দরজার ওপারে মাতলী নদীর ঘাট, সেখান দিয়েই মহিষ ঢুকেছিল রাজপ্রাসাদ দখল করতে। দুর্গার অভিমত, সেই রাস্তা দিয়েই ঢুকে রাজপ্রাসাদ পুনর্দখল করতে হবে। ভুবনেশ্বরীর পরিচিত বনবাসীদের সাহায্যে সেই ঘাটের বিপরীতে ঘন জঙ্গলে ঘাঁটি গাড়ল ওরা। গাছের ওপরে মাচান বাঁধা হলো, যেখান থেকে রাজপ্রাসাদের ওপর সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখা যায়।

রাত প্রায় দ্বিপ্রহর। টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে, সেই সন্ধ্যেবেলা থেকে চাঁদ অদৃশ্য, অনন্ত নক্ষত্রবীথিও অলক্ষিত। সবুজ অন্ধকারে ডুবে আছে ব্রহ্মার ভয়াল জঙ্গল। দম বন্ধকরা সেই অন্ধকার ভেদ করে মাঝেমাঝে এদিক-ওদিক থেকে ভেসে আসছে শিকার-সন্ধানী ক্রুদ্ধ বাঘের গর্জন। জঙ্গলের বাতাসে পচা পাতার গন্ধ। বন্য পশুর গন্ধ। মাচানে কালী ও দুর্গা। গাছের নীচে পাহারা দিচ্ছে চিঙ্কা, যাতে কোনও বাঘ অতর্কিতে গাছে উঠে আসতে না পারে। জঙ্গলের শরীরে বৃষ্টির জলতরঙ্গ। অপার্থিব সে স্তবগাথা শুনতে শুনতে লেগে এসেছিল ক্লান্ত চোখদুটো। ক্ষীণ একটা শব্দ সচকিত করে দিল দুর্গাকে। দেখল, এক এক করে পাঁচটি নৌকা জড়ো হলো ঘাটে। খিড়কির দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল। একটা একটা করে অনেকগুলো সিন্দুক রাজপ্রাসাদের ভেতর থেকে টেনে নৌকায় তোলা হলো। প্রতিটি নৌকায় দুটি করে সিন্দুক।

‘কী আছে সিন্দুকগুলোতে কে জানে!’ ফিসফিস করে বলল দুর্গা।

‘খুব ভারী কিছু আছে,’ বলল কালী।

‘কী করে জানলে?’

‘সিন্দুক তুলতেই নৌকাগুলো কতখানি জলের মধ্যে ঢুকে গেল, দেখলে না?’

‘ভারী জিনিস!’ বলল দুর্গা, ‘মহিষ চুপিসারে রাজপ্রাসাদ থেকে কী পাচার করছে?’

‘দাঁড়াও দেখছি,’ এই বলে বাধা দেওয়ার কোনও সুযোগ না দিয়ে কালী মাচান থেকে ঝাঁপ দিল

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন :—

কুমির-কিলবিল সেই নদীতে। ঝুপ করে একটা আওয়াজ, তারপর সব চুপচাপ। আতঙ্কে নিজের হাতে কামড় দিল দুর্গা। মেয়েটা কি পাগল!

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। একটি একটি করে সবক'টি নৌকা ঘাট ছেড়ে গভীর জলের দিকে এগোলো। সবার শেষের নৌকাটি আচমকা একটু নড়ে উঠল। দুর্গা দেখল, নৌকার মাঝির গায়ে কালো কী যেন অজগরের মতো জড়িয়ে রয়েছে। ছটফট করছে মাঝি, যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। হঠাৎ উল্টে গেল নৌকাটি। মাঝির আর্ত চিৎকারের মধ্যেই একটা কুমির ঝাঁপ দিয়ে তার দেহটা টেনে নিয়ে গেল কালো জলের গভীরে। হায় হায় করে উঠল খিড়কির প্রহরীরা। দেখতে দেখতে সিন্দুকগুলো তলিয়ে গেল জলের তলায়।

কালী কী হলো?

'দুর্গা!' ফিস ফিস করে কেউ যেন ডাকলো। কিছুই দেখতে পেল না। শুধু অনুভব করল দুর্গা, একটা কালো ছায়া দ্রুত গাছ বেয়ে ওপরে উঠে এল।

'কালী, তুমি!' আর একটু হলেই চিৎকার করতে যাচ্ছিল দুর্গা।

'এই দ্যাখো,' দু'হাতের মুঠি খুলল কালী। বাঁ মুঠো ভর্তি স্বর্ণমুদ্রা। ডান মুঠোয় একরাশ হিরে চুনী পান্না।

'গঙ্গানগরের কোষাগার এইভাবে খালি হচ্ছে প্রতি রাতে।' বলল কালী।

কর্দমাক্ত মাটি, প্রতিপদে পা ডুবে যায়। মাঝেমাঝে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়। সেই কাদা ঠেলে বৃদ্ধ লোকটি এগিয়ে চলেছে দ্বীপের মধ্যভাগের দিকে। মাঝেমাঝে টাল সামলাতে কোনও একটা গাছের উর্ধ্বমুখী শিকড় আঁকড়ে ধরতে হচ্ছে। অন্ধকার রাত। চাঁদ একফালি উঠেছে বটে, কিন্তু ঘন জঙ্গলের এই ঘেরাটোপের মধ্যে তার দেখা মেলা ভার। সে অভাব পুষিয়ে দিয়েছে জোনাকিরা, সংখ্যায় তারা লক্ষ লক্ষ। বিন্দু বিন্দু হলুদ আলো দিয়ে একটা নকশা এঁকেছে তারা, নিকষ কৃষ্ণকায় জঙ্গলের পটভূমিকায়। দল বেঁধে উড়ছে ইতিউতি, পথ দেখাচ্ছে বৃদ্ধকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে মশালের আলো নজরে পড়ল। গাছের ডালে বাঁধা মশালটা নদীর মৃদু বাতাসে দুলছে। তার নিচে গাছের শিকড়ে হেলান দিয়ে এক যুবক বসে আছে। বৃদ্ধকে আসতে দেখে সে উঠে দাঁড়ালো।

'রাজকুমার, কেমন আছো?' বৃদ্ধ বললেন।

'গুরুদেব, শুনলাম আপনি আমাকে খুঁজছেন!'

'হ্যাঁ, শুনলাম, তুমি নাকি এই দ্বীপে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তপস্যা করছ?'

'ঠিকই শুনেছেন গুরুদেব।'

'সে তপস্যার কতখানি অগ্রগতি হলো?'

'শহরের দুটো সৈন্য ছাউনি আমার সঙ্গে আছে, আমি সঙ্কেত করলেই তারা বিদ্রোহ করবে।'

'আর নৌবাহিনী?'

'তারা পিতৃস্বসার অধীনে। তাদের সাহায্য পাওয়া যাবে না।'

'আর কার কাছ থেকে সহায়তা পাওয়া যেতে পারে?'

'নাগরিকদের একাংশ আমার সঙ্গে আছে। লড়াইয়ের ময়দানে তারা কতটা কার্যকর হবে, তা প্রমাণসাপেক্ষ। কিন্তু সংবাদ সংগ্রহ বা অন্তর্ঘাতে নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য পাওয়া যাবে। বনবাসী ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সামরিক সাহায্য আমি পাব। বন্দরের শ্রমিকদের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে, আশা করছি, তাদেরও সমর্থন পাওয়া যাবে। কিন্তু রাজপ্রাসাদের বর্তমান রক্ষীরা সবাই মহিষের বিশ্বস্ত। এরা সবাই মহিষের উপজাতির, মহিষকে সর্বশক্তিমান জ্ঞানে ভক্তি করে। এরকম সহস্রাধিক সৈনিক আছে প্রাসাদে। রাজপ্রাসাদ জয় এই মুহূর্তে অসম্ভব।'

'তোমার পিতামহ মহীবলের ভাব নিয়ে জন্মেছো তুমি। সফল তুমি হবেই। মহাকালের ওপর ভরসা রাখো। তিনি শীঘ্রই তোমাকে সুযোগ করে দেবেন।'

'যথা আজ্ঞা গুরুদেব।'

'প্রাসাদের খবর শুনেছো কি?'

'কোন খবর গুরুদেব?'

'গুপ্ত সংবাদ পেয়েছি, মহিষ তোমার পিতৃস্বসাকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করেছে।'

'সেকি!' চমকে উঠল দিব্যবল, 'কেন, কী হল?'

'মায়াবলী ভেবেছিল, ধর্মত্যাগ করে, স্বজাতিদ্রোহ করে, মহিষের মহিষী হয়ে সমগ্র জম্বুদ্বীপ শাসন করবে। সে জানতো না, নারীর সম্মানের মূল্য কানাকড়িও নয় মহিষের কাছে। শোনা যাচ্ছে, ব্রহ্মারাজ্য পরিচালনার খুঁটিনাটি নিয়ে প্রায়শঃই মায়াবলীর সঙ্গে মহিষের মতবিরোধ হতো। এরকমই এক মতবিরোধের মুহূর্তে ক্রোধিত হয়ে মহিষ সে হতভাগিনীকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করেছে।'

একটা দমকা বাতাস এসে মশালটাকে জোরে নাড়িয়ে দিয়ে গেল। স্থানচ্যুত হয়ে গাছের কাণ্ডে ধাক্কা খেয়ে নিভে

গেল মশালের আলো। একরাশ আগুনের ফুলকি জ্বলতে জ্বলতে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। মুহূর্তে অন্ধকার ধেয়ে এল চারপাশ থেকে। আকাশ ফাটিয়ে বিদ্যুতের রুপোলি রেখা ধেয়ে গেল ঊর্ধ্ব থেকে অধোমুখে। প্রকৃতির সম্মোহন চূর্ণ হলো নভোস্থলের আর্তনাদে। ক্রুদ্ধ সরীসৃপের আস্ফালনের মতো সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস বইতে লাগলো হু-হু করে।

সুন্দরী জঙ্গলে হুল্লোড়। ঝড় আসছে ব্রঙ্গার মিশকালো সমুদ্রে।

ভুবনেশ্বরী মেঝের ওপর বিছিয়ে দিল বিরাট একটা চাদর। 'এই দ্যাখো— রাজপ্রাসাদের নকশা,' বলল ও।

'এ জিনিস তুমি কোথায় পেলে?' অবাক দুর্গা প্রশ্ন করল।

'রাজ-স্থপতির দপ্তরে,' বলল ভুবনেশ্বরী।

'রাজ-স্থপতির সঙ্গেও তোমার পরিচয় আছে?' হেসে বলল দুর্গা।

'না, তার সঙ্গে নয়,' বলল ভুবনেশ্বরী, 'তার ভৃত্যের সঙ্গে পরিচয় আছে। তাছাড়া রাজ-স্থপতিকে বললে কি আর সে এ জিনিস আমাকে দিত? কিন্তু ভৃত্যকে বলতেই সে বার করে দিল। অবশ্য কিছু পারিতোষিক দিতে হয়েছে তাকে।'

'কত?' জিজ্ঞেস করল দুর্গা।

'পঞ্চাশ স্বর্ণমুদ্রায় রফা হয়েছিল।'

'এত টাকা...'

'সে নিয়ে চিন্তা করো না,' বলল ভুবনেশ্বরী, 'আমার এক বন্ধু আছে— কমলা। সে টাকা দিয়েছে। ওর অনেক টাকা। ওর পরিবারের সপ্তডিঙ্গা ময়ূরপঙ্খী মলাক্কা পর্যন্ত যায়। আরও টাকা লাগলে তাও ওর কাছে পাওয়া যাবে।'

'জানো নিশ্চয়ই, ষট্‌কর্ণে মন্ত্রভেদ,' বলল দুর্গা, 'তোমার এই বন্ধুকে বিশ্বাস করা যায়?'

'নিশ্চিন্তে,' বলল ভুবনেশ্বরী, 'ও আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। তাছাড়া, মহিষকে ও মোটেই পছন্দ করে না।'

'যাই হোক, নকশাটা ভালো করে দেখা যাক,' বলল দুর্গা। 'হুঁ... সিংহদরজা, প্রাসাদ-প্রাচীর, সবই খাড়াই উঁচু, দুর্লঙ্ঘ্য, দেখেছো? তার ওপর ধাতব পাত দিয়ে মোড়া। বাইরে থেকে ভাঙা যাবে না। এর উল্টোদিকে খিড়কির দরজায় যেরকম কড়া পাহারা দেখলাম, সোজাসুজি নৌকা নিয়ে ওখান দিয়ে ঢুকতে গেলে আগেই জানাজানি হয়ে যাবে। কিছু একটা ভাবতে হবে এব্যাপারে। রাজপ্রাসাদের ভেতরেও তো অনেক সৈন্য, সেটা আরেকটা সমস্যা।'

'একটা মজার ব্যাপার খেয়াল করেছ,' বলল কালী, 'মাতলী নদীর একটা শাখা সোজা রাজপ্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। যেন এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে রাজপ্রাসাদটাকে।'

'এই ব্যাপারটা আমি শুনেছিলাম অনেককাল আগে,' বলল ভুবনেশ্বরী, 'আগে রাজপ্রাসাদটা ছিল শুধু মাতলীর শাখার পূর্বদিকে। পশ্চিমদিকে ছিল জঙ্গল। মহারাজ মহীবল শাখানদীর ওপর সেতু বানিয়ে রাজপ্রাসাদের চৌহদ্দিটাকে পশ্চিমদিকে বাড়িয়েছিলেন। প্রাসাদের প্রমোদ উদ্যান আছে ওদিকে, আর আছে অতিথিশালা। সেতুর ওপর খুব সন্দরভাবে মাটি ফেলে বাগান তৈরি করা হয়েছে। যে জানে না, সে বুঝতেই পারবে না, ওখানটায় নদী আছে।'

'সেই প্রমোদ-কানন ভেঙে ফেলে মহিষ ওখানে সৈন্য ছাউনি বানিয়েছে,' বলল কালী, 'বোঝাই যাচ্ছে, আর কেউ বাইশজন সৈন্য নিয়ে রাজপ্রাসাদ দখল করুক, সে পথ বন্ধ করার চেষ্টা করেছে। আর সেজন্যই খিড়কির দরজাতেও কড়া পাহারা বসিয়েছে,' বলল কালী।

'তার মানে, তার মানে', দুর্গার চোখ উৎসাহে জ্বলে উঠল, 'ভুবনেশ্বরী, তোমার চেনা কেউ আছে, যে বিস্ফোটকের ব্যবহার জানে?'

খড়্গ দিয়ে লতাপাতার জাল ছিন্ন করতে করতে এগিয়ে চলেছে দুর্গা। সঙ্গে কালী। কানে ভেসে আসছে ঝড়ের গর্জন, সমুদ্রের গভীর নিস্বন। বাতাসে লোনা গন্ধ। মাতলী নদীর অববাহিকা থেকে আরও কিছুটা দক্ষিণে গেলে দিগন্তরেখা জুড়ে নজরে পড়ে অগুনতি পালতোলা নৌকা। প্রায় দু'ক্রোশ জায়গা জুড়ে গঙ্গানগরের সমুদ্র-বন্দর। নৌকা সারাইয়ের ঠুকঠাক ও মালবাহকদের হাঁকডাকে মুখরিত। সেখান থেকে সোজা পূর্বদিকে চলতে থাকলে কিছুকাল পর দেখা যায়, কোলাহল স্তিমিত হয়ে এসেছে। জঙ্গল ঘিরে ধরেছে চারদিক থেকে। সঘন সে অটবি-ব্যূহের মধ্যে দিয়ে সমুদ্র স্থানে স্থানে হাত বাড়িয়েছে ডাঙার দিকে। সেইসব প্রণালীর ওপরে তৈরি হয়েছে বসতি। বন্দরের শ্রমিকরাই মূলত এখানে থাকে। প্রাচীন পাদপের ঘন

সারি দিয়ে ঘেরা প্রতিটি বাড়ি যেন একেকটি শান্তির নীড়। মাটি থেকে অনেক উঁচুতে বসতবাটি, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। সুন্দরী গাছের কাণ্ড দিয়ে তৈরি শক্ত কাঠামো, দরমার দেওয়াল। বর্ষায়, বন্যায়, ভরা কোটালেও এসব বাড়ি নিরাপদ থাকে। প্রতিটি বাড়িতে উঠোনের ওপর বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি তুলসীমঞ্চ। উঠোনের ধার ধরে বাঁশের তৈরি পাত্রে মাটি ফেলে নানান ঔষধি গাছ-গাছালি লাগানো হয়েছে প্রতিটি উঠোনে। এরকমই একটি জল-বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো কালী। বাড়িটার ওপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। সিঁড়ির কাঠগুলো ভাঙা। তুলসীমঞ্চ হেলে পড়ে আছে একদিকে। দরমার বেড়া খুলে কাত হয়ে ঝুলে পড়েছে জলের ওপর।

'দুর্গা', বলল কালী।

'উঁ', দুর্গার নজর জঙ্গলে দিকে, সেখান থেকে দৃষ্টি সরালো না ও।

'ওই বাড়িটার দিকে দ্যাখো,' বলল কালী।

দ্রুত বাড়িটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল দুর্গা, 'হুঁ, কেউ ভাঙচুর করেছে।'

'চলো দেখে আসি।' বলল কালী।

'বাড়ির মধ্যে ঢুকবে?' অবাক হল দুর্গা, 'কার বাড়ি কে জানে!'

'আমার মন বলছে, খারাপ কিছু একটা ঘটেছে এখানে,' বলল কালী, 'চলো, একটিবার দেখে আসি।'

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল দুর্গা। হাতে কিছুটা সময় রয়েছে। যার সঙ্গে দেখা করার কথা, সূর্যাস্তের আগে সে এখানে এসে পৌঁছাবে না।

'চলো,' বলল দুর্গা।

লাফিয়ে ভাঙা সিঁড়ি টপকে উঠোনে উঠল ওরা। দরমার দরজা ঠেলে সন্তর্পণে ঢুকলো কালী, পেছনে দুর্গা। দুজনের হাতেই উদ্যত খড়্গ। ভেতরের দৃশ্যটা দেখে চমকে উঠল ওরা। ঘরের মাঝখানে নারকোল দড়ির খাটিয়া, তার ওপর সস্তা কাপড়ের জীর্ণ বিছানা পাতা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সে বিছানা। বিছানায় পড়ে আছে একটি নারীদেহ, অচেতন। সে দেহের পাশে পড়ে আছে আরেকটি দেহ। সদ্যোজাত একটি শিশু।

'জাত' বলাটা কি ঠিক হবে? শিশুটি মৃত।

অচেতন মেয়েটির পাশে খাটের কোণে বসে আছে আরেকটি মেয়ে। অপূর্ব সন্দরী সে মেয়েটি। হাতে খল-নুড়ি, ঘন শ্যামলা গায়ের রঙে হালকা নীলচে আভা। একঢাল কালো চুল কাঁধে গড়িয়ে নেমেছে। সে চুল যাতে চোখের ওপর এলে না পড়ে, তারজন্য মাথার চারপাশে সোনালি কাপড়ের একটা ফেট্টি জড়ানো রয়েছে। বিছানায় শুয়ে থাকা অচেতন মেয়েটির শুশ্রূষা করছে। বিছানার ওপরে পড়ে আছে কাপড়ের পট্টক ও কাঁচি, একরাশ ঔষধি ও লতাপাতা। ঘরের কোণে মাটিতে একটি যুবক বসে আছে। দু-হাঁটুর মাঝে থুতনি। চোখদুটো স্থির, যেন মৃত মানুষের চোখ। সশস্ত্র কালী ও দুর্গাকে ঢুকতে দেখেও যুবকের কোনও ভাবান্তর হলো না। কিন্তু বিছানায় বসা মেয়েটি সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'কে তোমরা', শঙ্কিত গলায় বলল মেয়েটি।

'ভয় পেয়ো না বোন,' বলল কালী, 'এ হলো দুর্গা, আর আমি হলাম কালী। আমরা এইখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখে মনে হল, বাড়িতে কিছু একটা বিপদ ঘটেছে, তাই...'

'যদি নিজেদের ভালো চাও, তবে এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাও।' বলল মেয়েটি।

'নিজেদের ভালো যে আমরা চাই না বোন,' স্থির স্বরে বলল দুর্গা, 'এবার বলবে কি, এখানে কী হয়েছে?'

মেয়েটি অবাক চোখে তাকিয়ে দেখল ওদের দিকে। 'কে তোমরা?' জিজ্ঞেস করল, 'কোন বাড়ির মেয়ে?'

'আমরা গুরুকুলের মেয়ে,' বলল কালী।

'গুরুকুল? অক্ষুমুনির গুরুকুল?'

'হ্যাঁ।'

'আমিও তো সেখানে থেকেই বিদ্যার্জন করেছি,' অন্যমনস্ক ভাবে বলল মেয়েটি, 'কী যেন বললে তোমাদের নাম?'

'এ হলো দুর্গা, আর আমি কালী।'

'আমার নাম তারা,' বলল মেয়েটি, 'বসো এখানে। বলছি তোমাদের কী হয়েছে এখানে।'

কালী সন্তর্পণে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে খাটের পায়ার কাছে মাটিতে বসল। হাতের খড়্গ কোলের ওপর রেখে ওর পাশেই বসল দুর্গা। খলনুড়ি থেকে একটা কালচে সবুজ পদার্থ ধীরে ধীরে অচেতন মেয়েটির মুখে ঢেকে দিল তারা। তারপর এসে বসল কালীর পাশে।

'আমি বৈদ্য, সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো,' বলল তারা, 'এই মেয়েটির স্বামী আমাকে খবর দিয়ে নিয়ে এসেছে। লোকটির অসংলগ্ন কথাবার্তা থেকে যতটুকু বুঝেছি, সেটা হল, মহিষাসুরের আদেশ অমান্য করে মেয়েটি প্রতি সন্ধ্যায় লুকিয়ে তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বালাতো। কোনওভাবে মহিষের সৈন্যদের কানে খবরটা পৌঁছায়। কাল সন্ধ্যেবেলা ওরা হাতেনাতে ধরে ফেলে মেয়েটিকে। বাড়ি ভাঙচুর করে। মেয়েটিকে, ওর স্বামীকে প্রচণ্ড মারধর করে। মেয়েটির পেটে লাথি মেরেছিল ওদের কেউ। ওর গর্ভস্থ সন্তান গর্ভেই...'

শুনতে শুনতে দুর্গার চোয়াল শক্ত হয়ে এল। খড়্গার বাঁট

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ঃ—

KALA SANGAM

Kolkata

আঁকড়ে ধরল দৃঢ়মুষ্টিতে, আঙ্গুলের গ্রন্থিগুলো লাল হয়ে উঠল। কালী দেখলো, দরমার দেওয়াল ভাঙা ফোকর দিয়ে অস্তগামী সূর্যের আলো এসে পড়েছে অজাত শিশুটির মুখে। সন্বিত ফিরল কালীর। বাইরে বেরিয়ে দেখল, পূবের আকাশের নীল নিবিড় হতে শুরু করেছে। পশ্চিমাকাশে নানারঙের হিজিবিজি। সূর্যাস্তের কালখণ্ড সমাগত।

'দুর্গা', বলল কালী, 'যেতে হবে এখন। নাহলে...'

'হ্যাঁ,' উঠে দাঁড়ালো দুর্গা, দৃপ্ত কাঞ্চনবর্ণ ক্রোধের লাল আভায় জ্বলজ্বল করছে। তারার দিকে ফিরে বলল, 'এদের সহায়তা করতে এসেছ, তোমারও তো দেখছি প্রাণের মায়া নেই। ভালোই হলো। তোমার সঙ্গে কিছু জরুরি দরকার আছে। আগামীকাল সূর্যাস্তের পর একবার দেখা হতে পারে কি?'

চৌমাথার মোড়ে ব্যাঘ্রস্তম্ভ। তার পাশেই বিরাট একটা মাঠ। প্রতি বৃহস্পতিবার হাট বসে এখানে। ব্রঙ্গার গ্রাম-শহর থেকে বিক্রেতারা আসে পশরা নিয়ে। ক্রেতারা আসে সমগ্র জম্বুদ্বীপ থেকে। চাল-ডাল ও অন্যান্য কৃষিজ পণ্য অঢেল বিক্রি হয় এখানে। বিক্রি হয় মসলাপাতি। প্রদর্শিত হয় নানা শিল্পকর্ম। পাট বেত পোড়ামাটি থেকে শুরু করে সোনা, রুপো, তামার নানান মনোহারি কারুশিল্প। পিতলের ডোকরার কাজ। বিক্রি হয় অস্ত্র ও যন্ত্রাদি। ব্রঙ্গাহৃদিদের কারিগরী বিদ্যার খ্যাতি পৃথিবীজোড়া। হাট শেষে পণ্য বোঝাই হয় নৌকায়। রওনা হয় বিশ্বের নানান বন্দরের উদ্দেশ্যে। আগত ক্রেতা-বিক্রেতাদের মনোরঞ্জনের নানারকমের ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। মুখরোচক খাবারের অঢেল সম্ভারের গন্ধে আমোদিত হয়ে থাকে হট্টমেলার বাতাস। বাজিকররা খেলা দেখায় স্থানে স্থানে। ঘোড়ার খেলা, হাতির খেলা, সাপের খেলা, বাঘ-ভল্লুক-সিংহের খেলা। তিরন্দাজি, ছোরাবাজি, তলোয়ারবাজি, হাতসাফাই।

মাঠের ঠিক কেন্দ্রে বৃহৎ এক কাষ্ঠনির্মিত পেটিকার ওপর দণ্ডায়মান হয়ে উচ্চঃস্বরে ভাষণ দিচ্ছিল একটি লোক। দূর থেকে লোকটিকে ভীষণ চেনা-চেনা ঠেকলো দুর্গার। সেই তাপ্পিমারা আলখাল্লা, থুতনির ওপর চাপদাড়ি, সেই মহিষ করোটির শিরস্ত্রাণ, কালিমালিপ্ত চোখদুটির কোণে লুক্কায়িত সেই একই ভাব— বুভুক্ষা ও ক্রূরতা। ঠিক যেন গঙ্গার পাড়ের সেই অসু-উপাসক। কিন্তু তাকে তো... এ তবে কে? দুর্গা শুনতে পেল, লোকটি বলছে, 'ভাইসকল, বিদ্যাধরীর উত্তরে কদলীপত্র গ্রামে আমার বাস। সেই গ্রামের অষ্টভুজা শক্তিমাতার মন্দিরের কথা কে না শুনেছে। আমার পূর্বজ সবাই বংশ পরম্পরায় ভুবনখ্যাত সেই মন্দিরের পূজারি। আমিও হয়তো তাই হতাম। কিন্তু মহান অসুর অসীম কৃপা, আমার হাতে একদিন এসে পড়ল কৃসুণ্ডপুরাণ নামক একটি ধর্মগ্রন্থ। দেখলাম, মাতৃ-উপাসকদের রচিত সেই পুরাণের ছত্রে ছত্রে লুক্কায়িত রয়েছে মাতৃ-উপাসনার অবাস্তবতা ও ব্যভিচারের উদাহরণ। আবার সেই পুস্তকের মধ্যেই আমি খুঁজে পেয়েছি এই দুনিয়ার প্রভু অসুর শ্রেষ্ঠত্বের অকাট্য প্রমাণ। যে পুষ্পের সৌরভে সমগ্র জম্বুদ্বীপ মাতোয়ারা, আমাদের প্রভু সেই মহিষাসুরের আগমনবার্তা, তার ভবিষ্যদ্‌বাণীও পেয়েছি সেই কৃসুণ্ডপুরাণে। তাই আমি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছি আমার কদলীপত্র গ্রামের যাবতীয় পৈতৃক সম্পত্তি। অষ্টভুজার মন্দিরের পুরোহিতবৃত্তির লোভও আমি আনন্দের সঙ্গে ত্যাগ করেছি। ঘরসংসার ত্যাগ করে বেড়িয়েছি অসুধর্ম প্রচার করতে। ভাইসব, সময় এসেছে, আপনারাও...'

'কে এই লোকটি? চেনো নাকি একে?' ধীর পদক্ষেপে সেই জমায়েত থেকে দূরে সরে আসতে আসতে প্রশ্ন করল দুর্গা।

'এদেরকে বলে রক্তবীজ,' বলল ভুবনেশ্বরী, 'মহিষাসুর এদের নিয়োগ করেছে দেশজুড়ে অসুধর্ম প্রচার করতে। দুনিয়ায় যতরকমের মিথ্যে হয়, সেসব এরা বানিয়ে বলে লোকেদের অসুধর্ম গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ করে। এরা যত না অসুর প্রশংসা করে, তার চেয়ে বেশি করে অন্য ধর্মের নিন্দা। কেউ যদি তাতে ক্ষেপে গিয়ে কোনও রক্তবীজকে মারধর করে, অমনি মহিষাসুর সেই অজুহাতে সৈন্য পাঠিয়ে গ্রামকে গ্রাম শ্মশান করে দেয়।'

'ভারী অদ্ভুত কায়দা তো,' বলল দুর্গা, 'আর এই কৃসুণ্ডপুরাণ ব্যাপারটা কী? লেখাপড়ায় আমি খারাপ নই, পুরাণ অনেকেই পড়েছি। কিন্তু কৃসুণ্ডপুরাণ পড়া তো দূরস্থান, নামটাই কখনও শুনিনি।'

'মহিষাসুরের নির্দেশে বেশ কিছু নতুন পুরাণ লেখা হয়েছে, কৃসুণ্ডপুরাণ তাদেরই একটা। ভাষা ও আঙ্গিকে এগুলো আসল পুরাণের মতোই। কিন্তু এগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য অসুবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা, সঙ্গে নানা উপাসনাপদ্ধতিগুলিকে ব্যাভিচারী হিসেবে দেখানো। এইসব তথাকথিত পুরাণ পড়ে সত্যি বলে বিশ্বাস করে জম্বুদ্বীপের প্রকৃতিপূজকদের মতামত সব গুলিয়ে যাচ্ছে। নিজের ধর্মকে ঘৃণা করতে শুরু করছে, অসুবাদকে গ্রহণ করছে পরম আগ্রহে।'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা এসে পড়েছিল শেষপ্রান্তে। সেখানে একটি বটগাছের তলায় এক বাজিকর খেলা দেখাচ্ছিল। একটি ছোট্ট ছেলে একটা টাটুঘোড়ায় চড়ে এদিক থেকে ওদিক যাচ্ছে। যেতে যেতে আকাশে ছুঁড়ে দিচ্ছে একটা করে লেবু। বাজিকর নির্ভুল লক্ষ্যে বিদ্ধ করছে লেবুটাকে। কোনওবার ছুরি দিয়ে, কোনওবার তির দিয়ে, কোনওবার আবার গুলতি দিয়ে। প্রচণ্ড দ্রুততায় তির-ধনুক তুলে নিচ্ছে, তির ছুঁড়েই পরমুহূর্তে তুলে নিচ্ছে ছুরি বা গুলতি। মুহুর্মুহু হাততালি পড়ছে। হঠাৎ দর্শকদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল, ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে জনাদশেক সৈন্য, সবার মাথায় মোষের করোটির মুকুট। তাদেরই একজন জাপটে ধরল বাজিকরকে, হাতদুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। ভয়ে পালাতে লাগলো দর্শকরা।

'এ একি! কী অপরাধ করেছি আমি!' কাতরোক্তি করে উঠল বাজিকর।

'গত রবিবার সন্ধ্যেবেলা তুমি কী করছিলে?' জিজ্ঞেস করল সৈন্যদের দলপতি।

'আমি... আমি তো আমার বাসায় ছিলাম।'

'মিথ্যে কথা। ওদিন তুমি শহরের উপকণ্ঠে রাজসৈন্যদের আক্রমণ করেছিলে। ঠিক কিনা?'

'বিশ্বাস করুন, হুজুর, সে আমি নই, আমি এসবের বিন্দুবিসর্গও জানি না।'

'একটা মেয়ে এখানে বাঘ-সিংহর খেলা দেখাতো। খুব লম্বা-চওড়া একটা মেয়ে। সে আজ কোথায় আছে?'

'বাঘ-সিংহর নয় হুজুর, শুধু বাঘের খেলা। সে কোথায় আছে জানি না হুজুর! আমি তাকে কতটুকুই বা চিনি!'

'আবার মিথ্যা কথা!'

সৈন্যরা ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাজিকরকে মাটিতে ঠেলে ফেলে দিল। ভয়ে চোখ বুজে ফেলার আগে দেখলো বাজিকর, উদ্যত তরোয়াল নেমে আসছে ওর ওপর।

'অঁক্' একটা শব্দ হল। চিৎকার করারও সুযোগ পেল না সৈন্য দলপতি, মাটিতে ঢলে পড়ল। দুর্গা দেখলো, দলপতির গলায় বিঁধে আছে একবিঘত লম্বা একটা কালো তির। সচকিত হয়ে অন্য সৈন্যরা কোমর থেকে তরোয়াল খুলে অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। যেন কোনও জাদুমন্ত্রে একঝাঁক কালো তির বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ল আকাশ থেকে। প্রতিটা তির নির্ভুল লক্ষ্যে সৈন্যদের কণ্ঠা বিদ্ধ করল। আর্তনাদ করারও সুযোগ পেল না কেউ। দেখতে দেখতে খালি হয়ে গেল জায়গাটা। যে ক'জন দর্শক তখনও দাঁড়িয়েছিল, দৌড়ে পালালো। বাজিকর ও তার সঙ্গীও পালালো জায়গাটা ছেড়ে। ভুবনেশ্বরী দৌড়ে যাচ্ছিল বাজিকরকে আটকাতে, বাধা দিল দুর্গা।

'ও চলে গেলে ওকে আর পাওয়া যাবে না', বলল ভুবনেশ্বরী।

'দরকার নেই ওকে,' বলল দুর্গা, 'আমাদের দরকার ওই অদৃশ্য তিরন্দাজকে। এত ক্ষুদ্রকায় তির দিয়ে এত দূর থেকে এমন নির্ভুল ভাবে যে লক্ষ্যভেদ করতে পারে, তার মতো তিরন্দাজ ভূ-ভারতে বোধকরি আর দুটো নেই। চলো, খুঁজে বার করি লোকটাকে। আমার আন্দাজ, দক্ষিণের ওই গাছগুলোর কোনও একটায় চড়ে বসে আছে লোকটা।'

বিকেলের আলোর পরশ এখনও লেগে আছে নারকেল গাছগুলোর মাথায়। তাদের ঝাঁকড়া চুলে, তাদের ছুরির ফলার মতো পাতার পিঠে, এবড়ো-খেবড়ো কাণ্ডের খাঁজে সোনার টুকরো লেগে আছে এখনও।

ওধারে সমুদ্র, এধারে খাঁড়ি। মাঝে একফালি জমিতে সারবন্দি নারকেল গাছ। জোয়ারের সময় খাঁড়ি ভরে ওঠে। ভাটার সময় সে জল সমুদ্রে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে। বাধা দেয় গাছগুলো। জলধারার দল তখন গাছের এপাশ-ওপাশ দিয়ে পথ খোঁজে। সেরকমই একটি জলধারার পাশে, একটি বাজ-পড়া নারকেল গাছের তলায় বসে আছে দুর্গা, কালী, ভুবনেশ্বরী। আরও দুটি মেয়ে আছে ওদের সঙ্গে। একজন অস্বাভাবিক রকমের লম্বা, সেরকমই অস্বাভাবিক বলিষ্ঠ গড়ন। হাতে বিশাল এক রণকুঠার। মেয়েটির পেশীবহুল হাতে সে রণকুঠার মানিয়েছে ভালো। অন্য মেয়েটি লম্বায় সাধারণ হলেও বেশ বলিষ্ঠ তার গড়ন। সোনার মতো গায়ের রঙ, তেজদীপ্ত মুখমণ্ডল। পরনে হলুদ বস্ত্র।

'সংখ্যায় আমরা কম,' লম্বা মেয়েটি বলল, 'তাই সোজাসুজি লড়াইয়ে জেতা অসম্ভব। এটাই একমাত্র পথ।'

'ভৈরবী,' মেয়েটিকে বলল দুর্গা, 'এই পরিকল্পনার আরও একটা লাভ আছে।'

'কী সেটা?' জিজ্ঞেস করল ভৈরবী।

'মহিষের সৈন্যদের সবাইকে মেরে ফেলা সম্ভব নয়। কিছু সৈন্য তো পালিয়ে বাঁচবেই। তাদের ব্রহ্মায় ফিরে আসা আটকাতে হবে।'

'কীভাবে?'

‘এই পরিকল্পনার মূল লাভ, ওদের ভয় দেখানো যাবে,’ বলল দুর্গা, ‘যাতে আর কোনওদিনও ওরা ব্রহ্মার ধারেকাছে আসার সাহস না পায়। ব্রহ্মা-ভীতি যেন বংশ-পরম্পরায় ওদের তাড়া করে বেড়ায়।’

খিক্‌খিক্‌ করে হেসে উঠল অন্য মেয়েটি।

‘হাসছো কেন?’ প্রশ্ন দুর্গার।

‘ভাবছি, মহিষের লোকজন যখন তাদের রাজ্যে ফিরে গিয়ে ব্রহ্মার জাদুটোনা, ভূতপ্রেত আর বাঘ-সিংহরূপী অপচ্ছায়াদের গল্প করবে, তখন ওদের মুখগুলো কেমন দেখাবে।’

‘বগলামুখী’, বলল দুর্গা, ‘তোমার ওপর কিন্তু খুব বড় দায়িত্ব রইল। আমাদের সবার প্রাণ এখন তোমার হাতে।’

‘মনে থাকবে। কাউকে মুখ খুলতে দেবো না সে রাতে। টুঁ-শব্দটি করতে দেব না। আমার বাবা ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর ছিলেন। আমি তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্যা। তিরন্দাজীতেও আমার মোকাবিলা করার মতো কেউ নেই ওই রাজপ্রাসাদে।’

বিড়বিড় করে বলল ভৈরবী, ‘আসছি আমরা, পারলে সামলা।’

‘কিছু বললে?’ প্রশ্ন দুর্গার।

‘না, কিছু না,’— বলল ভৈরবী, ‘সামনের ক’টা দিন খুব সাবধানে থাকতে হবে আমাদের সবাইকে। আর মনে রাখতে হবে, ষট্‌কর্ণে মন্ত্রভেদ।’

অনেক পাখি দেখা যায় এখানে। বিশেষ করে এই সময়ে। বিকেলবেলায়।

চারিদিকে ঘন জঙ্গলের মাঝে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জলা, সমুদ্রের খাঁড়ির অংশ। তারই মাঝে ছোট্ট একটা গ্রাম। মাত্র সাতটা পরিবারের বাস এখানে, তারা সবাই পেশায় জেলে। শহরের মাৎস্যন্যায়ের আঁচ এখনও এখানে এসে পৌঁছায়নি। মানুষ-পাখি-গিরগিটি-পতঙ্গ-গাছপালা সবাই বেশ মিলেমিশে রয়েছে। চারিদিকে শান্তি, কোনও তাড়া নেই কারোর। গা-ছমছমে হিজিবিজি শিকড়ের দঙ্গল, তিমির-সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে জলতল জুড়ে। তার ঠিক পাশেই তালপাতায় ছাওয়া ছোট্ট একটা পর্ণকুটির। কুটিরের সামনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে মাছ শুকোতে দেওয়া হয়েছে। সমুদ্রের লোনা বাতাসে শুঁটকি মাছের তীব্র গন্ধ। বারান্দায় শীতলপাটির ওপর তিনজন মানুষ বসে আছে। প্রথমজনের গাত্রবর্ণ অত্যধিক ফর্সা। জম্বুদ্বীপে এত ফর্সা মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। সারা গায়ে ছাই মেখে সে বর্ণ প্রেতগাত্রের রূপ নিয়েছে। মাথাভর্তি জটা, সে জটার চুড়োয় জড়ানো রুদ্রাক্ষের মালা। গলা ও হাতেও রুদ্রাক্ষের মালা। পরনে ব্যাঘ্রচর্ম। দ্বিতীয় ব্যক্তি যেন প্রথমজনের সাক্ষাৎ বিপরীত। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, এতটাই কালো যে চট করে দেখে মনে হয় গায়ের রং ঘন নীল। সুবিন্যস্ত লম্বা চুল মাথার ওপর চুড়ো করে বাঁধা। চুড়োয় গোঁজা ময়ূরের পালক। কণ্ঠে তুলসীর মালা। উপবীত। পরনে হলুদ রেশম বস্ত্র। দু’জনেই অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকৃতি। তৃতীয়জনের গায়ের রঙ তামাটে, পরনে শ্বেতবস্ত্র। তুলনায় খর্বাকৃতি, রোগা। সাদা লম্বা চুল, লম্বা সাদা দাড়ি।

‘শুঁটকির গন্ধে কি খুব অসুবিধা হচ্ছে, মুনিবর?’ প্রশ্ন প্রথম ব্যক্তির।

‘আপনি বোধহয় আমার কথায় খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না, তাই না রুদ্র?’ তৃতীয় ব্যক্তি দৃশ্যতই কিছুটা অসহিষ্ণু।

‘গুরুত্ব কেন দেব না, মুনিবর?’ জবাব রুদ্রর, ‘কিন্তু একদিকে মহিষ, অন্যদিকে এগারোজন মেয়ে, তাদের অধিকাংশই বয়ঃসন্ধির। যাদের কারোর যুদ্ধবিদ্যা বা রাজনীতিতে কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। এ তো আত্মহত্যার শামিল!’

‘আপনি তবে বিশ্বাস করছেন না, এই দুর্গা মেয়েটির মধ্যে অভাবনীয় কিছু আছে?’

‘কেন বিশ্বাস করব না?’ রুদ্র বললেন, ‘কিন্তু মনে হয় না, এই মুহূর্তে কারোর পক্ষেই মহিষকে পরাজিত করা সম্ভব।’

‘আমি রুদ্রর সঙ্গে একমত,’ বললেন দ্বিতীয়জন, ‘আবহমানকাল থেকে আমার সংগঠন ভারতীয় সমাজে শুভশক্তির বিকাশ ঘটানোর দায়িত্ব পালন করে এসেছে। যাতে সেখানে অশুভ শক্তির আবির্ভাব না হয়। কিন্তু আমরা শত চেষ্টাতেও মূর্তিমান অশুভ এই মহিষের জন্ম বা অগ্রগতি রোধ করতে পারিনি।’

‘আর আমার সংগঠনের দায়িত্ব,’ বললেন রুদ্র, ‘ভারতীয় সমাজে অশুভ শক্তির জন্ম হলে সে শক্তিকে চিহ্নিত করা ও তার বিনাশ ঘটানো। কিন্তু আমরাও তো মহিষকে সময়মতো চিহ্নিত করতে পারিনি, দমন করতে পারিনি। আদিযোগী শঙ্করের কাছে এজন্য আমি দণ্ডার্হ!’

‘শুধু আমরা দু’জনেই নয়,’ বললেন হরি, ‘সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, পবন, বরুণ আদি এদেশের প্রকৃতি-উপাসক প্রত্যেক সম্প্রদায় আলাদা আলাদা ভাবে মহিষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে।

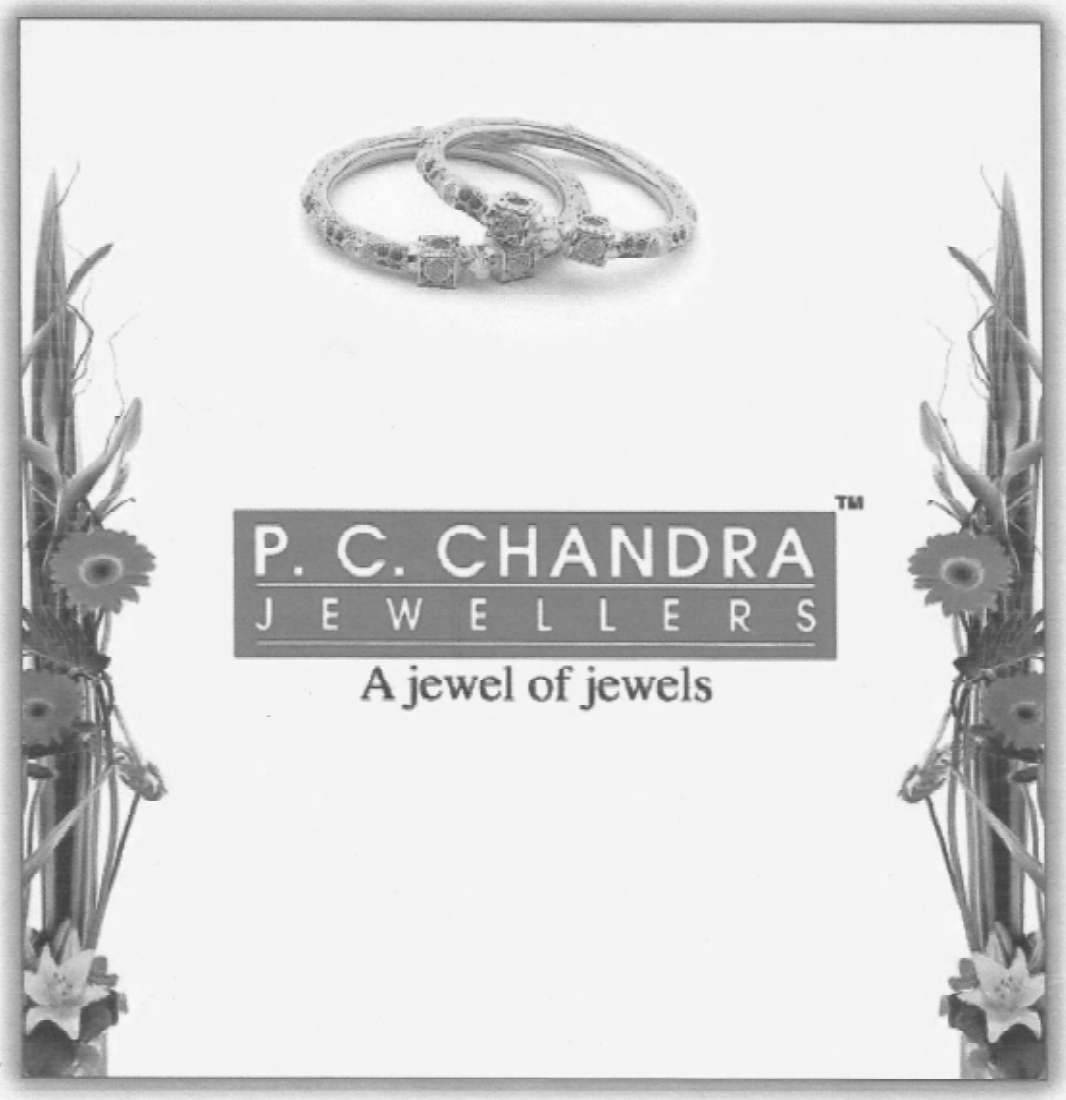

Kolkata Showrooms:Bowbazar:2227272;Gariahat :24618680; Chowringhee:22238062; Golpark : 24645370 ; Ultadanga :23554747; Barasat :25843093; Serampore :26526413; Behala :23970204; Howrah:9836211515.Baruipur: 8336923180,Hatibagan: 25330207, Sodepur: 25655251, Newtown: 25722016.
West Bengal Showrooms : Asansol :[0341]2274-331; Siliguri:[0353]2532194; Malda [03512] 256558; Burdwan :[0342]2569652; Midnapore:[03222]261996; Behrampore: [03482]259066 ; Cooch Bihar :[03582]228301; Durgapur :[0343]2588121 Chandan Nagar :26858581;Tamluk:[03228]266525; Kanchrapara:25854417 ; KrishnaNagar: [0347] 2223109,Raigunj: 0352 3244076, Jamshedpur:0657 2222126,Siuri: 07797401111,Katoa: 07407305555,Bankura: 0324 2259929, Purulia : 6294743189
Other States Showrooms :Delhi: [011]40616364; Bangaluru :[080] 49344444 Bhubaneshwar [0674] 2380888; Agartala:[0381]2326666.,Noida : 0120 4102516 Mumbai : 022 26406030.

কেউ মহিষকে হারাতে পারেনি। সে তো আপনি জানেন।'

অন্যমনস্ক অক্ষুমুনি তাকালেন জলের দিকে। গাছগুলোর শিকড় নেমে এসেছে জল পর্যন্ত, ছায়া-ছায়া অন্ধকার তৈরি করেছে জলের ধার ধরে। কত নাম-না-জানা পতঙ্গ ও মাছের বাস ওই ছায়াঘন স্থানগুলিতে।

'আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন,' বললেন অক্ষুমুনি, 'হয়তো সেখানেই আপনাদের ভুল। আপনারা আলাদা আলাদা ভাবে লড়েছেন মহিষের বিরুদ্ধে। হয়তো দরকার ছিল, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব ও সব দেবগনের শক্তিকে সংহত করে একযোগে মহিষের বিরুদ্ধে লড়াই করা।'

'তা সম্ভব নয়,' বললেন রুদ্র, 'শিব ও বিষ্ণুর শক্তি বিপরীতধর্মী। আমাদের সংগঠনের চরিত্র ও প্রবৃত্তি ভিন্ন। আমি বিষ্ণুর সংগঠনকে নেতৃত্ব দিতে পারি না, হরিও পারে না আমার সংগঠনকে নেতৃত্ব দিতে। যদি তা চেষ্টা করি, তবে সমাজের মধ্যে যে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হবে, তাতে গোটা সমাজই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

জলের ওপর ঝুলন্ত শিকড়ে চড়ে একটা গিরগিটি আরামে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। নীচে জলে অনেক মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝেমাঝে ঘাই মারছে, জলে ছোট ছোট তরঙ্গ উঠছে। মন বড্ড খারাপ আজ। মৃন্ময়ীর মৃত্যুটাকে কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছিলেন না অক্ষুমুনি। বারবার মেয়েটার মুখটা ভেসে উঠছে চোখের ওপর। সন্তানস্নেহে তিলে তিলে গড়ে তোলার পর তার এমন পরিণতি... আজও জানেন না অক্ষুমুনি, যেদিন মৃন্ময়ীর বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা হবে, সেদিন কী বলবেন তাদের।

'সারাক্ষণ যেন টুংটাং ঘন্টি বাজছে কোথাও,' হঠাৎ প্রশ্ন অক্ষুমুনির, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'পাখির ডাক,' বললেন বিষ্ণু, 'ওই দেখুন, পাখিটা।'

অক্ষুমুনি দেখলেন, ছোট্ট একটা পাখি, ঘন পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে আছে। ঘন নীল বর্ণ, উজ্জ্বল কমলা রঙের লেজ। মাঝেমাঝেই ইতিউতি উড়ছে। এক ডাল ছেড়ে অন্য ডালে গিয়ে বসছে দুরন্ত ক্ষিপ্রতায়। এতটাই ক্ষিপ্র যে প্রায়-অদৃশ্য হয়ে গেছে ওর আনাগোনা।

'পাখিটা যে এত সুন্দর উড়ছে,' বললেন অক্ষুমুনি, 'তাতে তো পাখির গোটা শরীরই একযোগে কাজ করছে, তাই না? ডানাজোড়া যদি ভাবতো, আগে লেজ চেষ্টা করে নিক, তারপর আমি চেষ্টা করব, তাহলে পাখিটা কি কোনওদিনও উড়তে পারতো?'

'আপনি কী বলতে চাইছেন, বুঝতে পারছি না মুনিবর', বললেন রুদ্র, 'কিন্তু মহিষের যুদ্ধে বারবার পরাজয়ে দেবতারা এখন হতোদ্যম। আরেকটি পরাজয় তাদের অস্তিত্বের সংকট তৈরি করবে। এই মুহূর্তে মহিষ অপরাজেয়। তাকে হারানোর সঠিক পন্থা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। অনুগ্রহ করে একটু ধৈর্য ধরুন।'

'তবে আর কী? আপনারা আপনাদের মতো চেষ্টা করুন, ওরা ওদের মতো চেষ্টা করুক। মহিষের হাতে সবচেয়ে বেশি সম্মানহানি হয়েছে নারীদেরই। তাই মহিষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের লড়াইটাও ওরাই করুক। কে বলতে পারে, মহাকালের হয়তো সেটাই ইচ্ছা। যাই আমি, সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় বয়ে গেল। প্রণাম!'

শীতলপাটির আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন অক্ষুমুনি। উঠোন থেকে নেমে এগিয়ে গেলেন পাড়ে অপেক্ষারত ছোট্ট ডিঙি-নৌকাটির দিকে। ওঁর চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে হরি ও রুদ্র চুপচাপ বসে রইলেন অনেকক্ষণ।

সূর্য ঢলছে, হলুদ থেকে কমলা হচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ টিয়া নেমে আসছে গাছের ডালে। কিচিরমিচিরে কানে তালা ধরে যায়। জেলে পরিবারগুলো একে একে মাছ ধরে ফিরছে। তাদের ভাটিয়ালি সুরে প্রকৃতি-বন্দনা সন্ধ্যার আকাশ-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। ঠাণ্ডা বাতাসে বিদেহী হাতের পরশ। বিস্মৃত জন্মের অন্তরাল সরিয়ে ভিড় করছে অজস্র অশরীরী। গাছের ফাঁকের জমাট অন্ধকারে বেগুনি কুয়াশার লুকোচুরিতে কাদের যেন ফিসফিস। ওরা কারা? ওরা কি এখানেই থাকতো, অনেক অনেকদিন আগে? লক্ষ দু-লক্ষ বছর আগে? শরীর পঞ্চভূতে বিলীন হলেও আত্মা ওদের এখনও এই জল-জঙ্গলের মায়ায় আবিষ্ট। ওরা কি পূর্বজ? এই জম্বুদ্বীপের প্রথম সভ্য মানব? যারা প্রথম আগুন জ্বেলেছিল? চাকা বানিয়েছিল? গণিত আবিষ্কার করেছিল? বুক দিয়ে আড়াল করে বাঁচিয়েছিল এই সমাজটাকে, আদিম উন্মত্ত পৃথিবীর প্রতিটি আক্রমণ থেকে? প্রতিপদে ভয়কে জয় করে জীবনের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল যুগ থেকে যুগান্তরে?

ওঁরা কি কিছু বলতে চাইছেন?

বাতাসে অরণ্যের গন্ধ। অনেক মায়া সেই সোঁদা বাতাসে।

ক'দিন পরের কথা। রুপোর থালার মতো চাঁদ উঠেছে দিগন্তরেখার ওপরে। রুপোলি আলোয় ঝলমল করছে

গঙ্গানগর। ঝলমল করছে ব্রঙ্গার সুন্দরবন। প্রাসাদশীর্ষ থেকে দু'চোখ ভরে সেই দৃশ্যই দেখছিল সেনাপতি চিক্ষুষ। কাঠখোট্টা মানুষ সে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে কোনওকালেই আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ব্রঙ্গায় আসার পর থেকে সবকিছু কেমন যেন একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। মাটি তার নিজের মতো করে বদলে নেয় মানুষকে। এমনকি, আক্রমণকারীকেও। সবাইকে নয়, তবে কাউকে কাউকে। চন্দ্রালোকের সৌন্দর্যসুধা উপভোগ করতে করতে মদিরার ভৃঙ্গারে চুমুক দিচ্ছিল চিক্ষুষ আর ভাবছিল, কী যে এক আশ্চর্য মদিরা বানায় এই স্থানীয়রা, ভূ-ভারতে এর জুড়ি মেলা ভার। তণ্ডুলজাত এই তরল জলবৎ স্বচ্ছ, অথচ ধমনীতে ছড়িয়ে পড়ে অগ্নিস্রোতের ন্যায়। চন্দ্রালোককল্প এই মদিরার মাত্র এক ভৃঙ্গারই ভূমানন্দের অনুভূতি জাগায়। ভুলিয়ে দেয় জগৎসংসার।

'অসুর জয় হোক!' দরজার কাছ থেকে কে যেন বলল।

'কে? ও, বিলোচন। এত রাতে, কী ব্যাপার?'

'আজ্ঞে, একটা সমস্যা ঘটেছে।'

'কী সেটা?' চিক্ষুষ বলল।

'আজ বহুদিন পরে নগরের প্রতিটি গৃহে তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলতে দেখা যাচ্ছে।'

'তুলসীতলায় প্রদীপ! ক'টা গৃহে?'

'আজ্ঞে, বলললাম যে, সবকটি গৃহে।'

'বলছো কী! তোমার কোনও ভুল হয়নি তো?'

'আজ্ঞে, ভুল হয়নি।'

'বৃক্ষপূজা! নগরবাসীদের সকলের কি একসঙ্গে ভীমরতি হয়েছে? তারা কি মহিষাসুরের আজ্ঞা ভুলে গেছে?'

'আজ্ঞে, শুধু তাই নয়, নাগরিকরা স্থানে স্থানে মিছিল বার করেছে। হাতে তাদের অস্ত্রশস্ত্র, মশাল, নরকরোটি। হাবভাব দেখে তো মনে হচ্ছে, নগরবাসীরা বিদ্রোহ করবে ঠিক করেছে।'

'বিদ্রোহ, করাচ্ছি। যাও, প্রাসাদের ছাউনি থেকে পাঁচশত সৈন্য নিয়ে এক্ষুনি নগরে ছড়িয়ে পড়ো। প্রতিটি প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে, প্রতিটি নাগরিককে রাজপথ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তবে ফিরে আসবে।'

'যথা আজ্ঞা সেনাপতি।'

বিলোচন চলে গেলে পাশ থেকে মদিরার ভৃঙ্গারটি আবার তুলে নিল চিক্ষুষ। পুনরায় ডুবে গেল মায়াবী চন্দ্রালোকের সৌন্দর্যসুধায়।

অপার্থিব বনজ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে দশদিক। জঙ্গলের মধ্যে একদল শৃগাল রাত্রির প্রথম যাম ঘোষণা করল এইমাত্র। রাজপ্রাসাদের খিড়কির ঘাট দিয়ে একটু আগেই প্রতি রাতের নিয়মমতো দশ সিন্দুক ধনরত্ন পাচার হয়েছে। বাকি রাতে আর কিছু হবার সম্ভাবনা নেই। প্রহরীরা নিরুদ্বিগ্ন মেজাজে তাই একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছিল। নারীকণ্ঠের কান্নার আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠল। দেখল, একটি নৌকা ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে। সে নৌকায় বসে আছে একাকি একটি মেয়ে। চাদরে মুখ ঢাকা, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মুহূর্তে দশজন প্রহরীর দশটা বর্শা উদ্যত হলো নৌকাটির দিকে।

'কে ওখানে?' হাঁক দিল প্রহরীদের দলপতি।

'আমি ষোড়শী!' কান্নাভেজা গলায় উত্তর ভেসে এল নৌকা থেকে। সেই কণ্ঠস্বর শুনেই সৈন্যদের হৃদ্‌স্পন্দন নিমেষে দ্বিগুণ হয়ে গেল। কে এই মেয়ে? কার এত সুন্দর কণ্ঠস্বর?

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো মেয়েটি। মাথার ওপর জড়ানো চাদরটা আলগা করে ফেলে দিল। নিটোল গোলাকার চাঁদের রুপোলি আলোর সবটুকু এসে পড়ল মেয়েটির মুখে। গলা শুকিয়ে গেল প্রহরী দলপতির। জগতের সব নারীর সব সৌন্দর্য এক করে যেন তৈরি করা হয়েছে মেয়েটিকে। দলপতির শিরায় শিরায় ছুটলো আগুনের বন্যা। প্রায় দৌড়ে জলে নেমে নৌকাটিকে ঘাটে ভেড়ালো সে। হাত ধরে মেয়েটিকে নৌকা থেকে নামিয়ে আনলো। সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র একটা মিষ্টি গন্ধে মাতাল হয়ে উঠল দলপতি সহ প্রতিটি সৈন্যর শরীর-মন।

'সর্দার,' ফিসফিস করে বলল এক রক্ষী, 'এ মেয়েকে মহিষাসুরের কাছে ভেট দিলে অনেক বকশিস পাওয়া যাবে।'

'চুলোয় যাক বকশিস, আর গোল্লায় যাক মহিষাসুর।' চাপা গলায় গর্জে উঠল দলপতি, 'এ মেয়েকে না পেলে জীবনই বৃথা।'

মাতাল-করা গন্ধটা অবশ করে দিচ্ছিল প্রহরীদের অনুভূতিগুলোকে। বোধবুদ্ধি লোপ পাইয়ে দিচ্ছিল। চেষ্টা করেও সেটা আটকাতে পারছিল না কেউ।

'তুমি একাই... সর্দার? আর আমরা কি এখানে শুধু বসে থাকবো?' বলল আরেকজন রক্ষী।

'খবরদার!' চিৎকার করে উঠল দলপতি, 'এ মেয়ে শুধু

আমার।' এই কথা বলেই সে আচমকা গদা তুলে সেই রক্ষীর মাথায় বসিয়ে দিল। ব্রহ্মতালু ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। তাই দেখে অন্য রক্ষীরা আক্রমণ করল দলপতিকে। দেখতে দেখতে ধুন্ধুমার বেধে গেল। দলপতির গায়ে অসম্ভব শক্তি। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, সে একাই টিকে আছে, বাকি রক্ষীরা ভূমিশয্যা নিয়েছে।

'চলো সুন্দরী, আর তর সইছে না।' এই বলে মেয়েটির কবজি আঁকড়ে ধরল দলপতি।

হঠাৎ চাঁদের ওপর একটা কালো ছায়া প্রবেশ করল। জ্যোৎস্নার ফিনিক-ফোটা আলো ম্লান হয়ে গেল নিমেষে। চন্দ্রগ্রহণ শুরু হয়েছে।

'দাঁড়াও।' কঠোর গলায় বলল মেয়েটি, 'আমি তোমার সঙ্গে আদৌ যেতে চাই কিনা, সেটা তো জিজ্ঞেস করলে না?'

'তুমি নারী, তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছার আবার দাম কী! চলো আমার সঙ্গে! নাহলে এখানেই প্রকাশ্যে তোমাকে সম্ভোগ করব।'

'তাই নাকি?' কে যেন বলল পেছন থেকে।

'কে!' চমকে পেছন ফিরে তাকালো দলপতি। দেখল, যেন কোনও মন্ত্রবলে আরেকটি মেয়ে আবির্ভূত হয়েছে সেখানে। বলিষ্ঠ গড়ন, তেজদীপ্ত মুখমণ্ডল, সোনার মতো গায়ের রঙ, পরনে হলুদ রঙা বস্ত্র। যেন একটুকরো সূর্য আবিভূত হয়েছে মাতলীর ঘাটে। চিৎকার করার সুযোগ পেল না সর্দার। মুহূর্তে মেয়েটি এগিয়ে এসে বাঁ-হাত দিয়ে দলপতির জিভ টেনে ধরল। ডান হাতের এক ঝাঁকুনিতে কবজির ভেতর লুকোনো মুগুরটা বেরিয়ে এল, সেটা ধড়াম করে এসে পড়ল প্রহরী দলপতির মাথায়। ছেঁড়া জিভটা জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফিসফিস করে বলল বগলামুখী, 'মেয়েদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, সেটা যখন শিখিসনি, তখন এজন্মের মতো আর কথা বলার দরকার নেই তোর।'

চাঁদ অদৃশ্য হয়েছে আকাশ থেকে। অন্ধকারে ডুবে গেছে প্রকৃতি। সবার চোখ এড়িয়ে আরও চারটি নৌকা চুপিসারে জড়ো হয়েছে ঘাটে। তারই একটা থেকে লাফিয়ে নামলো দুর্গা। প্রাসাদের বন্ধ দরজায় গুনে গুনে চারবার ধাক্কা দিল।

'কে?' চাপা গলার আওয়াজ শোনা গেল ওদিক থেকে।

'আদি পরাশক্তি', ফিসফিসিয়ে বলল দুর্গা।

'উদ্দেশ্য?' প্রশ্ন অন্যদিক থেকে।

'সন্তানজ্ঞানে সমাজের প্রতিপালন,' বলল দুর্গা।

'প্রমাণ?' আবার প্রশ্ন ওদিক থেকে।

Mahavir Institute of Education & Research

Affiliated with I. C. S. E.

&

I. S. C.

17/1, Canal Street, Kolkata - 700 014

Ph. No. 2265-5821/22

A School of UKG to Class - XII

(English Medium)

For Boys & Girls

'ঐম হ্রীম ক্লীম।' দুর্গার উত্তর।

খিড়কির দরজা খুলে গেল। ওদিকে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। নোংরা তার জামাকাপড়। গা-ময় একরাশ সবজেটে শ্যাওলা।

'মাতঙ্গী!' মেয়েটির হাত চেপে ধরল দুর্গা, 'তোমার জন্য খুব চিন্তায় ছিলাম।'

'ওসব আদিখ্যেতা পরে হবে, আগে আমাকে আমার কাজের জায়গাটা দেখিয়ে দে দিকি।' খনখনে গলায় কে যেন বলে উঠল। দুর্গার পেছনেই দাঁড়িয়ে কালী। তার কোলে এক কঙ্কালসার বৃদ্ধা। শনের দড়ির মতো পাকানো সাদা চুল। মাত্র ক'গাছি দাঁত মুখে, মাড়ি অস্বাভাবিক রকমের কালো। গায়ে শতচ্ছিন্ন তালিমারা পোশাক।

'অ্যাই মেয়ে, ওরকম সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? নামা আমাকে মাটিতে।' ধমক দিল বৃদ্ধা।

'এই নাও বুড়িমা, নামো।' বৃদ্ধাকে মাটিতে নামিয়ে দিল কালী।

'খবদ্দার, আমাকে বুড়িমা বলবি না, আমার নাম ধূমাবতী।' বলল বৃদ্ধা, 'এখন চল, আমাকে দেখিয়ে দিবি, কোথায় কাজটা করতে হবে। তোদের মধ্যে কে আমাকে নে'যাবি?'

'মাতঙ্গী তোমাকে সব দেখিয়ে দেবে,' হেসে বলল দুর্গা, 'গত এক সপ্তাহ ধরে ও এই প্রাসাদে চাকরানির কাজ করছে।'

প্রাসাদ-চূড়ায় প্রহরের ঘণ্টা বাজলো। পরমুহূর্তেই তুমুল বিস্ফোরণের আওয়াজে মাটি কেঁপে উঠল। ধোঁয়ায় ঢেকে গেল প্রাসাদ। অন্ধকার ও চোখ-ধাঁধানো আলো মিশে এক নারকীয় হট্টগোল তৈরি হলো। লোকজন অন্ধের মতো ইতস্তত দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে কতজনকে যে পায়ে পিষে মেরে ফেলল, তার আর ইয়ত্তা নেই। ধোঁয়া কাটলে দেখা গেল, প্রাসাদের পশ্চিমদিক আলাদা হয়ে গেছে পূর্বদিক থেকে। সৈন্যাবাসের সবাই সেখানে আটকা পড়ে গেছে। হঠাৎ চারিদিকের অন্ধকার জঙ্গলে অসংখ্য স্বরে উলুধ্বনি শুরু হল। সঙ্গে সেখান থেকে সৈন্যাবাসের ওপর শুরু হল একনাগাড়ে বিষ তির বৃষ্টি। দিশেহারা সৈন্যরা যে যেখানে পারলো, ঢাল দিয়ে শরীর আড়াল করে মাটিতে শুয়ে রইল। কয়েকজন সৈন্য জলে ঝাঁপ দিয়ে এপারে আসার চেষ্টা করল। পাড়ে ওঠার আগেই তাদের টেনে নিয়ে গেল কুমিরে। সিংহদুয়ারের ওপরে তির-ধনুক হাতে পাহারা দিচ্ছিল কয়েকজন সৈন্য। তারা নীচে তাকিয়ে দেখল, দরজা ভেঙে একদিকে কাত হয়ে পড়ে আছে। সেই ভাঙা দরজা দিয়ে ঢুকছে বিশালাকায় এক ব্যাঘ্রে আরোহিণী ততোধিক বিশালাকায়া এক নারীমূর্তি। লম্বায় যে কোনও দীর্ঘদেহী পুরুষের থেকেও সে অনেক বেশি লম্বা। হাতে তার উদ্যত কুঠার, পিঠে বাঁধা ত্রিশূল। তার পেছন পেছন সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে আসছে একপাল হলুদ-কালো ডোরাকাটা বাঘ। প্রমাদ গুনলো সৈন্যরা। ব্রঙ্গার বাঘ, সে বাঘ নয়, মূর্তিমান প্রেতবিশেষ। মানুষের মতোই বুদ্ধি ধরে। গাছেও ওঠে, জলেও সাঁতার দেয়। জন্ম-নরখাদক। মহিষের সৈন্যরা এমনটিই শুনে এসেছে জন্মাবধি। ব্রঙ্গায় আসার আগে তাদের বাড়ির লোকেরা পইপই করে বলে দিয়েছিল, ব্রঙ্গার বাঘ থেকে দূরে থাকতে। সেই বাঘ এতগুলো একসঙ্গে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করেছে।

'কী দেখছো! তির চালাও।' চিৎকার করে উঠল তিরন্দাজ দলপতি। তড়িঘড়ি ধনুকে তির সংযোজন করল সৈন্যরা, কিন্তু জ্যা-মুক্ত করার সুযোগ পেল না। প্রাসাদ-শীর্ষ থেকে একরাশ তির ছুটে এল, নির্ভুল লক্ষ্যে বিদ্ধ করল প্রতিটি সৈন্যকে। বিষে অসাড় হয়ে তারা একে একে গড়িয়ে পড়ল নীচে। প্রাসাদ-শীর্ষে লুকিয়ে থাকা বগলামুখীর উদ্দেশে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে ভৈরবী ঢুকে পড়ল ভেতরে।

প্রাসাদের রাত-প্রহরায় নিয়োজিত প্রায় তিনশো সৈন্য প্রাসাদের প্রাঙ্গণে জড়ো হয়েছিল। ভৈরবী ও তার ব্যাঘ্র-বাহিনী ঝটিকা গতিতে আক্রমণ করল তাদের। মহিষের সৈন্যরা যদি মাথা ঠাণ্ডা রেখে লড়াই চালাতো, তাহলে লড়াইয়ের ফলাফল কী হতো বলা কঠিন। মাতঙ্গী গতরাতে সৈন্যদের খাবারে এক বিশেষ ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল। আচমকা বিস্ফোরণ, ব্রঙ্গার বাঘের আজন্ম-লালিত ভয়, পরশু-ধারী নারীমূর্তির অতর্কিত আক্রমণ, সব মিলিয়ে সৈন্যদের মানসিক অবস্থা এমনিই শোচনীয়। ওষুধের প্রভাবে সে আতঙ্ক শতগুণে বর্ধিত হয়ে উঠল। দিশেহারা সৈন্যরা দেখল, শয়ে শয়ে ভূতপ্রেত ঘিরে ধরেছে চারদিক থেকে, তাথৈ তাথৈ নাচছে, ঘাড় মটকে খাচ্ছে সৈন্যদের। ভয়ে তারা পালাতে শুরু করল খিড়কির দরজার দিকে। দেখল, সেখানে দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে অতিকায় সিংহে আরোহিণী আরেক নারীযোদ্ধা। দুদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে সেনারা চক্রাকারে ব্যূহ রচনার একটা শেষ চেষ্টা করল। হঠাৎ কালো কুচকুচে প্রকাণ্ড একটা নেকড়ে যেন আকাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সৈন্যদের ব্যূহের ঠিক মাঝখানে। সে নেকড়ের পিঠে আরোহিণী ঘোর কৃষ্ণাঙ্গী এক নারীযোদ্ধা। হাতে তার

রক্তমাখা খড়্গ, গলায় মুণ্ডমালা, চোখে ধিকিধিকি রক্তপিপাসা।

কোথায় যেন শঙ্খ বেজে উঠল। কানফাটানো শব্দে।

ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো, স্রোতের মতো ছড়িয়ে পড়ল দশদিকে। শত্রুরুধিরে অভিষেক হলো পরাশক্তি। কচুকাটা হতে লাগলো মহিষের দিশেহারা সৈন্যরা।

এত গোলমাল কীসের?

প্রতিরাতে শুতে যাবার আগে কিছু ব্রহ্মাবাসীর মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা না করতে পারলে মহিষের ঘুম আসে না। গত রাতেও প্রায় সাড়ে ছ'হাজার ব্রহ্মাবাসীকে হত্যা ও তাদের মুণ্ড দিয়ে অসুর বিজয়স্তম্ভ বানানোর নির্দেশ দিয়ে তারপর শুতে গিয়েছিল মহিষাসুর। যতক্ষণ ঘুম আসেনি, ততক্ষণ একের পর এক মদিরার ভৃঙ্গার খালি করে গিয়েছে। নেশা তাই বেশ কড়া হয়েছিল। ঘুম ভাঙতে দেরি হলো। রঞ্জক দিয়ে রাঙানো চাপদাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে ঘুমচোখে শয়নকক্ষের গবাক্ষ দিয়ে অলস দৃকপাত করল নীচে প্রাঙ্গনে। মুহূর্তে সব ঘুম উড়ে গেল, মাথা পুরোদস্তুর গুলিয়ে গেল। মহিষাসুর দেখল, প্রাসাদ-প্রাঙ্গনে ভুতুড়ে চাঁদের আলোয় একপাল বাঘ সৈন্যদের ধরে ধরে খাচ্ছে, তাদের ওপর তাণ্ডবনৃত্য করে বেড়াচ্ছে তিন ভীষণাকায়া নারীমূর্তি।

গতরাতের মলিন শয্যার দিকে ক্ষণিক দৃকপাত করল মহিষ। বিছানার কোণে পড়ে আছে নিরাভরণ নির্জীব দুটি নারীশরীর। ঘৃণাভরা তাদের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে দ্রুত পোশাক পরিবর্তন করে নিল। কোমরে গুঁজলো অস্ত্রশস্ত্র। মাথায় পরল মহিষ-করোটির শিরস্ত্রাণ। দরজা খুলে বেরোতেই দেখল, খণ্ডযুদ্ধ চলছে সেখানেও। মহিষের দেহরক্ষীরা লড়াই করছে দু'জন কুশলী নারীযোদ্ধার সঙ্গে। এবং মোটেই পেরে উঠছে না। এদের পেছনে তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে একজন লোলচর্মাবৃতা বৃদ্ধা। শিড়িঙ্গে লম্বা, অস্বাভাবিক রোগা, বয়সের গাছপাথর নেই তার। বিড়বিড় করে কী যেন মন্ত্র পড়ছে, আর ক্রমাগত ঝোলা থেকে ধুলোর মতো কিসব যেন বার করে ছুঁড়ে মারছে দেহরক্ষীদের দিকে। যার গায়ে সে ধুলো পড়ছে, সেই যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে।

ধুলো-পড়া!

ডাকিনী!

ভূত-প্রেত!

বাঘ!

ব্রহ্মার কালো জাদু!

পরিস্থিতি মোটেই ভালো ঠেকল না। চুলোয় যাক ব্রহ্মার রাজকোষ! সিঁড়ি বেয়ে নিচের দিকে দৌড়লো মহিষ।

ভেবেছিল, প্রাসাদের খিড়কির দরজা দিয়ে পালাবে। নীচে নেমে দেখল, সে দরজা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে রক্তবস্ত্র পরিধান একটি মেয়ে। হাতে তার খড়্গ। বিদ্যুৎগতিতে এদিক থেকে ওদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে সে খড়্গ, মহিষের সৈন্যদের কচুকাটা করছে। মেয়েটির বাঁ-হাতে জড়ানো লাল রংয়ের মণিবন্ধ, কনুই পর্যন্ত ঢাকা। তাতে সোনালি সুতোয় শক্তিযন্ত্র আঁকা। যেমনটি পাহাড়ের শক্তি-উপাসকরা ধারণ করে। বাঁ চোখের ওপরের পুরনো ক্ষতটা নতুন করে টনটন করে উঠল। 'নোংরা পৌত্তলিক!' দাঁতে দাঁত পিষে বলল মহিষ, 'তোরা সবাই নরকে যাবি।' চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করল, তারপর খুব ধীরে ধীরে, প্রায় স্বগতোক্তির ঢঙে ফিসফিস করে বলল, 'রক্তবীজ... রক্তবীজ... কোথায় তুমি?'

দুর্গা অনুভব করল, হঠাৎ যেন আঁধার ঘনিয়ে এল পেছনদিক থেকে। চকিতে মাথা নীচু করে পাশ ফিরল, সেই গতিতেই খড়্গ ঘুরিয়ে প্রতিহত করল তরবারির আক্রমণ। যুগপৎ তিনটি তরবারির আক্রমণ। প্রচণ্ড সে আঘাতে দু-টুকরো হয়ে গেল দুর্গার খড়্গ। দুর্গা দেখল, উদ্যত তরবারি হাতে কৃতন্তসম তিনজন অসুর। প্রায় একইরকম দেখতে তাদের। একইরকম পোশাক, মাথায় একইরকম শিরস্ত্রাণ, থুতনির ওপর একইরকম চাপদাড়ি, একইরকম লোভী ক্রূর ক্ষুধিত নৃশংস দৃষ্টি। নিরস্ত্র দুর্গাকে অসহায় ভেবে দ্বিগুণ উৎসাহে আক্রমণ করল তারা তিনজন। ক'পা পিছু হটল দুর্গা। হঠাৎ ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিল আকাশের দিকে। তীব্র আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হল দুর্গার হাতের তালু থেকে। পরমুহূর্তে দেখা গেল,আলোর তৈরি এক ভীষণাকায় ত্রিশূল আবির্ভূত হয়েছে ওর হাতে। সেই ত্রিশূলের দুই বাহু যেন দুটি তরবারি, মধ্যবাহুটি সুদীর্ঘ এক শূল। মুহূর্তে যেন রক্তস্রোতের বিস্ফোরণ হলো। আলোর ত্রিশূলের চকিত প্রহারে ছিন্নভিন্ন হলো তিন রক্তবীজ। তিনটে মুণ্ডু ছিটকে পড়ল তিনদিকে, তিনটে নিথর ধড় এলিয়ে পড়ল মাটিতে। শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এক অপরিসীম ঘৃণার স্রোত অনুভব করল মহিষ। মনে হল, অসুর-শ্রেষ্ঠত্বের রাজপথ আড়াল করে একলা দাঁড়িয়ে আছে রুধিররঞ্জিত ওই পৌত্তলিক মেয়েটি। 'তিন রক্তবীজ খুন হয়েছে, তার জায়গায় তিনশো রক্তবীজ জন্মাবে। কিন্তু তুই... তুই তো নরকে যাবি।' বিড়বিড় করতে করতে মহিষাসুর কোমরবন্ধ থেকে বার করে আনলো একটা ধাতব

গোলক। ব্রহ্মা-সম্প্রদায়ের এক বিজ্ঞানীকে উৎকোচ ও চাটুকারিতায় তুষ্ট করে এই দিব্যাস্ত্র নির্মাণ করিয়েছিল মহিষ। এ অস্ত্র ব্যবহার করে একের পর এক দেবতাকে যুদ্ধে পরাস্ত করা গেছে, এই মেয়ে তো কোন ছার। লক্ষ্য স্থির করে সে গোলক মাথার ওপর তুললো। সেই মুহূর্তেই অতর্কিতে একটা ছায়া মহিষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাঁধের ওপর চড়ে আঁকড়ে ধরল মহিষের গলা। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল মহিষের। প্রাণ বাঁচাতে সেই গোলক আততায়ীর ওপরে প্রয়োগ করল মহিষ। আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল আক্রমণকারী।

ইতস্তত পতনোন্মুখ দেহগুলোর ফাঁক দিয়ে মহিষের অপস্রিয়মাণ ছায়াটাকে দেখতে পেল দুর্গা। দেখতে পেল, মাটিতে পড়ে আছে রক্তবর্ণের এক নারীদেহ। 'তারা। শিগগির এসো।' চিৎকার করে ডাকলো দুর্গা।

সেনাপতি চিক্ষুষ যুদ্ধে নিহত হয়েছে। নিহত হয়েছে অধিকাংশ অসুর সেনানী। মহিষ পালিয়েছে। কীভাবে পালিয়েছে, কেউ জানে না। কেউ বলছে, মোহনায় ওর অর্ণবপোত মোতায়েন ছিল, তাতে করেই পালিয়েছে। কেউ আবার বলছে, ব্রঙ্গার পশ্চিম সীমান্তের জঙ্গল পার হয়ে পালিয়েছে সে। শহরে মহিষের সৈন্যরা দিব্যবলের বিদ্রোহী সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। বনবাসী, শ্রমিক ও মৎস্যজীবীদের জনসেনা শহরের সীমান্ত সুরক্ষিত করেছে। বিদ্রোহী নাগরিকরা ঘরে ঘরে তল্লাশি চালাচ্ছে আত্মগোপনকারী মহিষ সেনাদের সন্ধানে। ব্রঙ্গার নৌসেনা দিব্যবলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে।

একরাশ মৃতদেহের মাঝে বসে আছে রক্তস্নাতা দুর্গা। মহিষকে আক্রমণ করেছিল যে মেয়েটি, তার মাথা কোলে নিয়ে। মেয়েটির শরীর অস্বাভাবিক রকমের লাল হয়ে গেছে। মাথার চুল, ভুরু, চোখের পাতা— সব পুড়ে উঠে গেছে। 'এ এক আশ্চর্য অস্ত্র,' বলল তারা, 'শরীরের অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতের বিন্যাস বদলে দিয়েছে অস্ত্রটা। ওকে বাঁচাতে পারবো কিনা, জানি না।'

'ভেবে খুব ভালো লাগছে, 'ক্ষীণকণ্ঠে বলল মেয়েটি, 'একটা ভালো কাজে জীবন দিলাম।'

'খবরদার, এরকম কথা বলবি না', বলল দুর্গা, 'তোকে আমরা বাঁচিয়ে তুলবোই।'

'তাহলে কি চলে বোন,' অতিকষ্টে হেসে বলল মেয়েটি, 'নাম আমার ছিন্নমস্তা। ধড়ে যদি মাথাটা আস্ত থাকে, তবে আমি সার্থকনামা হলাম কীভাবে?'

একটি ট্রেন চোখের নিমেষে ১৫ মিটার এবং সেকেন্ডে ২৫ মিটার পথ অতিক্রম করতে পারে

রেললাইনের আশেপাশে মোবাইলে ব্যস্ত থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সম্প্রতি রেললাইনে বা প্ল্যাটফর্মের ধার ঘেঁষে ফোনে কথা বলা বা মেসেজ পাঠানোর জন্য এবং চলন্ত ট্রেন থেকে বাইরে ঝুঁকে সেলফি বা গ্রুফি তোলার জন্য দুর্ঘটনায় কয়েকটি জীবনহানি ঘটেছে।

নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মেনে চলুন

- রেললাইনে অথবা চলন্ত ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে সেলফি/গ্রুফি তুলবেন না।
- প্ল্যাটফর্মের বা রেললাইনের ধার ঘেঁষে চলার সময় কখনোই মোবাইলে কথা বলবেন না অথবা গান শুনবেন না।
- রেললাইনে হাঁটা বা হেঁটে পারাপার করা বিপজ্জনক। এটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ।
- রেললাইন এবং ট্রেনের কাছ থেকে সর্বদা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- রেলওয়ে পরিসরে স্টিল ক্যামেরা/মুভি ক্যামেরা/স্মার্টফোন ক্যামেরার মাধ্যমে যে কোনো ধরণের ফটোগ্রাফি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও আইনত দণ্ডনীয়।

আরও দায়িত্বশীল হোন, সতর্ক হোন

ট্রেনের কার্যক্রমের যে কোন অনুসন্ধানের জন্য	যে কোন অভিযোগে অথবা জরুরি চিকিৎসার জন্য	যাত্রী সুরক্ষার জন্য
ডায়াল করুন: ১৩৯	ডায়াল করুন: ১৩৮	ডায়াল করুন: ১৮২

পূর্ব রেলওয়ে
আপনার সুরক্ষাই আমাদের লক্ষ্য

Follow us on @EasternRailway www.er.indianrailways.gov.in Like us on @easternrailwayheadquarters

ছিন্নমস্তাকে জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল দুর্গা। প্রতি প্রহরে ছিন্নমস্তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকলো। তারা তার ভেষজবিদ্যা থেকে সবরকম নিদান ব্যবহার করল, কোনও লাভ হলো না। শ্বাসকষ্ট শুরু হলো ছিন্নমস্তার।

'বোন, আমি চললাম,' বলল ছিন্নমস্তা।

'আমাকে বাঁচাতে গিয়ে তুই দিব্যাস্ত্রের প্রহার নিয়েছিস। যদি তুই মারা যাস, আমি তবে কীভাবে বাঁচি বলতো?' কান্নাভেজা গলায় বলল দুর্গা।

'আমি কি একটু চেষ্টা করতে পারি?' পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল। দুর্গা তাকিয়ে দেখল, দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ শুভ্রবর্ণ এক সাধক। হাতে ত্রিশূল, মাথায় জটাজুট, সারা গায়ে ছাই মাখা।

'কে আপনি?' জিজ্ঞেস করল তারা, 'আপনি কি এর চিকিৎসা করতে পারবেন?'

'লোকে আমাকে বৈদ্যনাথ বলে,' বলল সাধক, 'বৈদ্যবিদ্যা কিছুটা জানা আছে আমার।'

মৃত্যুর সঙ্গে তারা ও বৈদ্যনাথ রুদ্রর যুদ্ধে হার হলো মৃত্যুর। ভোরের সূর্যের প্রথম কিরণ এসে পড়ল ছিন্নমস্তার মুখে। চোখ খুলল ছিন্নমস্তা।

'মরার ইচ্ছেটা তোর স্থগিত রইল,' বলল দুর্গা।

'হ্যাঁ,' ধীরে ধীরে বলল ছিন্নমস্তা, 'ওটা আরেকদিন করা যাবে।'

'দূর হ পোড়ারমুখী।' কপট রাগে মুখঝামটা দিতে গিয়ে হেসে ফেলল দুর্গা।

'দাদা!' বলল দিব্যবল।

দিব্যবলকে ঘরে ঢুকতে দেখে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো অনঙ্গ।

'এ আমি কী শুনছি দিব্য!' বলল অনঙ্গ, 'মহাবলী মহিষাসুর নাকি ব্রঙ্গা ছেড়ে চলে গেছেন।'

'সে ছেড়ে যায়নি,' বলল দিব্যবল, 'আদ্যাশক্তি দুর্গা তাকে তাড়িয়েছেন। আমিও তাঁকে সাহায্য করেছি।'

'তাহলে আমি ঠিকই শুনেছি,' বলল অনঙ্গ, 'কী সর্বনাশ করেছ, বুঝতে পারছো কি?'

'সর্বনাশ? কার সর্বনাশ?'

'আমার সর্বনাশ! তোমার নিজের সর্বনাশ! ব্রঙ্গার সর্বনাশ! তিনি যে সাক্ষাৎ অসু! তাঁকে অপমান করেছ! আকাশ থেকে আগুন-বৃষ্টি হবে তোমার মাথার ওপর।'

'দাদা, চুপ করো।'

'শোনো দিব্য! তোমার বড় দাদা হিসেবে আমি তোমাকে আদেশ করছি। যাও, এইমাত্র গলবস্ত্র হয়ে মহাবলী মহিষাসুরকে সসম্মানে ব্রঙ্গায় ফিরিয়ে আনো। তাঁকে করজোড়ে বিনতি করো, যেন তিনি ব্রঙ্গার অবাধ্য দুর্বিনীতি প্রজাদের ক্ষমা করে দেন। তিনি যেন...'

'দাদা!' চিৎকার কলে উঠল দিব্যবল, 'কী বলছ তুমি! যে লোকটা আমাদের বাবাকে খুন করেছে, আমাদের পুরো পরিবারটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, তোমাকে নপুংসক বানিয়েছে, দিনের পর দিন তোমার ওপর যৌন নিপীড়ন চালিয়েছে...'

'তিনি যে অসুর প্রেরিত দূত! ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তার তিনিই তো একমাত্র প্রতিনিধি। এ শরীর তো তাঁরই দান। তিনি আমার এই নশ্বর শরীরটাকে ভালোবেসেছেন, আমি ধন্য হয়েছি।'

'ভালবাসা! এই নারকীয় অত্যাচারকে তুমি ভালবাসা বলো?'

'তাঁর ভালবাসা বোঝার ক্ষমতা তোমার নেই দিব্য! তুমি মূর্খ, অজ্ঞান। আমি তাঁকে ভালোবাসি। আমি তাঁর দাসানুদাস!'

'এসব কী বলছ দাদা!'

'ঠিকই বলছি। তাঁকে ছাড়া আমার জীবন অর্থহীন। তাঁকে তাড়িয়ে বিরাট ভুল করেছ তোমরা। এরজন্য যে কী বিরাট সর্বনাশ নেমে আসবে ব্রঙ্গার ওপর, সে বিষয়ে কোনও ধারণাই নেই তোমার। যে অসু, যে সর্বশক্তিমান, তিনি তাঁরই...'

'চুপ করো', ক্রোধে ফেটে পড়ল দিব্যবল, 'আমার ইচ্ছে করছে, এই মুহূর্তে তোমার মুণ্ডুটা এক কোপে ধড় থেকে আলাদা করে ফেলি। কিন্তু না, তুমি আমার দাদা, আমি সেটা করতে পারবে না। তবে তোমাকে ছেড়ে দিতেও পারি না। আজ থেকে তোমার ঠিকানা হবে অন্ধকূপ। অন্তত যতদিন না মহিষাসুর-বধ সম্পন্ন হচ্ছে।'

'সর্বনাশ হোক তোমার!' চিৎকার করে উঠল অনঙ্গ, 'তুমি শুদ্ধু ব্রঙ্গার প্রতিটি নাগরিক নরকের আগুনে জ্বলেপুড়ে মরবে, মৃত্যুর পর।'

'তোমার ওই নরককে ভয় পাই না আমি', বলল দিব্যবল, 'মৃত্যুর পর কী হবে, সেটা মৃত্যুর পর দেখা যাবে। তার জন্য স্বজাতিদ্রোহ করবো না আমি। কিন্তু তুমি? তোমার কী হবে? তুমি দেশদ্রোহী, স্বজাতিদ্রোহী। তোমার ইহলোকেই নরক-দর্শন

হবে। দেখি, তোমার সর্বশক্তিমান মহিষাসুর তখন তোমাকে বাঁচাতে পারে কিনা।'

গট্‌গট্‌ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দিব্যবল। রাগে আগুন জ্বলছে মাথায়। বুকের মধ্যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আরও কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কে জানে, সেখানেও হয়তো একই কথা শুনতে হবে।

আজ সকাল থেকে একটার পর একটা অশুভ সংবাদ আসছে। অলতু গ্রামে আশ্রয় নেওয়া বিপুল সংখ্যক অসুর গোপনে অলতু ত্যাগ করে ব্রহ্মার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা কে কোথায় গেছে, কোথায় লুকিয়ে আছে, কেউ তা জানে না।

মাতৃভক্তদের ছিন্নমুণ্ড দিয়ে রাজ্যের স্থানে স্থানে অসুর বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেছিল মহিষাসুর। পালাবদলের সঙ্গে সেইসব স্তম্ভকে ভূলুণ্ঠিত করতে শুরু করেছে মাতৃভক্তরা। তাই নিয়ে লড়াই বাধছে অসুবাদীদের সঙ্গে। অসুস্তম্ভ নাকি অসুবাদীদের ভক্তির কেন্দ্র। এ রাজ্যে অসুবাদীদের সংখ্যা কম নয় আজ। গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে ব্রহ্মার স্থানে স্থানে। কী করা উচিত এখন? রাজধর্ম বলে, অপরের ভক্তিকে মর্যাদা দিতে। অসুবাদীদের ভক্তির মর্যাদা দিতে হলে দাসত্ব ও অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ ওইসব বিজয়স্তম্ভকে রক্ষা করতে হবে। নিপীড়িত মাতৃভক্তদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে। সেটা কীভাবে সম্ভব?

অসংখ্য রক্তবীজ ছড়িয়ে আছে ব্রহ্মার আনাচে-কানাচে। তারা কী ষড়যন্ত্র করছে কে জানে। তার ওপর একটু আগেই খবর এসেছে, মহিষের মহিষীও পালিয়েছে। কখন, কেউ জানে না। অন্ধকূপে পিতৃস্বসা মায়াবলীর প্রকোষ্ঠ খালি পড়ে রয়েছে।

বড় দিশাহারা বোধ হচ্ছে আজ। মা আদ্যাশক্তি, পথ দেখাও মা!

ছ'মাস পরের কথা।

মহাভারতের বিস্তীর্ণ মালভূমিতে সমবেত হয়েছে মহিষাসুরের সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী। পাঁচ লক্ষ মোষের খুরের ঘর্ষণে আকাশ ধুলোয় মেঘলা হয়ে গেছে। সূর্যের মুখ দেখা যায় না। বহুক্ষণ ধরে এখানে প্রতীক্ষা করছে মহিষাসুর। দিনের দ্বিতীয় প্রহর প্রায় অতিক্রান্ত। এর মধ্যেই তো এসে পড়ার কথা তার। এখনও এসে পৌঁছালো না কেন?

With Best Compliments from -

Ganpati Laminators

&

Packagers Pvt. Ltd.

থোকা থোকা লাল-হলুদ ফুল ফুটে আছে সবুজের পটভূমি জুড়ে। বাতাসে গরম বালির গন্ধের সঙ্গে বয়ে আসছে জংলি মাটি-পাতা-ফুলের ঝাঁঝালো গন্ধ। দূরে দিগন্তরেখার কাছে সবুজ উঁচুনীচু পাহাড়ের সারি যেন দুর্লঙ্ঘ্য এক প্রাচীর রচনা করেছে। ওখানেই মধ্যভারতের মালভূমি মিশেছে ছোটনাগপুর মালভূমিতে। ওটাই ব্রঙ্গার সীমান্ত। হে অসু! যদি তুমি সর্বশক্তিমানই হবে, তবে ভূমিকম্পে বজ্রপাতে ধ্বংস করে দিচ্ছ না কেন ওদের? ওরা যারা ওই সীমানার ওপারে দাঁড়িয়ে আছে, তোমার বিজয়ের পথ আগলে?

হঠাৎ তূর্যনিনাদে কেঁপে উঠল মাটি। সবুজ পাহাড়ে জাগলো আন্দোলন। জঙ্গল ভেদ করে আবির্ভূত হল ত্রিশূলব্যূহে সজ্জিত অতিকায় অভূতপূর্ব এক সেনাবাহিনী। সে সেনাবাহিনীর দক্ষিণ বাহুর নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহাপক্ষী গরুড়ে আসীন হরি। তাঁর পেছনে সারিবদ্ধভাবে প্রতীক্ষারত বিষ্ণুর বাহিনী। শৃঙ্খলাপরায়ণ, যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ। তাদের শীতল দৃঢ়চেতা দৃষ্টি প্রত্যয়ের আলোয় উদ্ভাসিত। সেনাবাহিনীর বাম বাহুর নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহাকায় এক বৃষে আসীন ত্রিশূলপাণি রুদ্র। তাঁর পেছনে সমবেত হয়েছে শিবের বাহিনী। তারা প্রেতকল্প, উগ্রতেজা, উগ্রচণ্ডা। মাথায় জটাজুট, শ্মশ্রুগুম্ফে ঢাকা তাদের মুখ। কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, ভস্মচ্ছাদিত রুধিররঞ্জিত দেহ। তাদের মুহুর্মুহু রণহুঙ্কার ও আস্ফালনে মৃত্যুর হৃদয়েও ভয়কম্প জাগে।

জম্বুদ্বীপের প্রত্যেক প্রকৃতি-উপাসক সম্প্রদায় তাদের শ্রেষ্ঠ বীরদের নিয়ে সমবেত হয়েছে বিশাল সংখ্যায়। সমুদ্রের মতো বিশাল তাদের ব্যাপ্তি। বাহিনীর মধ্যভাগ রক্ষা করছে তারা। বিচিত্র তাদের পোশাক, ততোধিক বিচিত্র তাদের অস্ত্রশস্ত্র।

ব্যূহের সম্মুখভাগ রক্ষা করছে ব্রঙ্গার সেনাবাহিনী। তাদের এক লক্ষ অতিকায় রণহস্তীর ছন্দোবদ্ধ পদক্ষেপে গুরুগুরু কাঁপছে ধরাধাম। হরিহরের যৌথ আহ্বানে সাড়া দিয়ে জম্বুদ্বীপের পূর্ববাহু থেকে, প্রাগজ্যোতিষের ওপার থেকে তিন লক্ষ সেনানী এসেছে এই মহারণে যোগ দিতে। সুদূর ব্রহ্ম, শ্যাম, চম্পা, বরুণ, সুমাত্রা, মহার্লিকা, যবদ্বীপ, কালীমন্থন থেকে এসেছে তারা— জম্বুদ্বীপের অপৌরুষেয় সংস্কৃতিকে সমূহ বিনাশ থেকে রক্ষা করতে। বাহন তাদের খর্বাকৃতি হস্তী। সে হস্তী অশ্বের মতো দ্রুতগামী, ক্ষুরধার বুদ্ধি তাদের। অনায়াসে পাহাড় টপকায়, অবাধে ভেদ করে ঘন বনানী। বাহিনীর অন্তভাগে দুর্ভেদ্য এক অর্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহরচনা করেছে তারা।

অভূতপূর্ব এই অতিকায় বাহিনীকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এক অসামান্য তেজস্বিনী নারী, এক অতিকায় সিংহে আরোহিণী। রক্তবর্ণের বস্ত্র পরনে, স্বর্ণরঞ্জিত রক্তবর্ণের মণিবদ্ধ হাতে জড়ানো। তাঁর পেছনে দশজন নারী-যোদ্ধা, দশ-মহাবিদ্যা। কালী, ভুবনেশ্বরী, কমলা, ভৈরবী, বগলামুখী, ষোড়শী, মাতঙ্গী, ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা, তারা। কেউ বাঘ, কেউ সিংহ, কেউ বা নেকড়ের পিঠে আসীন। প্রত্যেকের হাতে ব্রহ্মা-সম্প্রদায় নির্মিত বিবিধ দিব্য আয়ুধ।

দুরুদুরু কাঁপছে মহিষাসুরের বুক। জীবনে এই প্রথম প্রাণের ভয় জাগলো তার বুকে। সারাজীবন পৌত্তলিকদের ঘৃণা করেছি আমি। যথেচ্ছ সম্ভোগ করেছি নারীদের, অচেতন ভোগ্যপণ্যের মতো ব্যবহার করেছি তাদের। আর আজ এক পৌত্তলিক নারীর হাতে আমার নিধন হবে?

হে অসু, তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ করেছ?

ঝাপসা চোখে মহিষাসুর দেখল, তেজপ্রভায় দশদিক উদ্ভাসিত করে তার দিকে ধেয়ে আসছে অতিকায় সিংহে আসীন রক্তবস্ত্র-পরিধান এক অসামান্যা তেজস্বিনী নারী। তাঁর দশ হাতে দশ দিব্যায়ুধ। ■

TRADE CENTRE (INDIA)

37, Lenin Sarani
Kolkata - 700 013

e-mail : t.c.india@vsnl.net

Fax : 91-33-2249, 8706
Ph. : 2249-8722

With Best Compliments of :

MAKAIBARI TEA
&
TRADING
COMPANY
PRIVATE LIMITED

Regd. Off. : Kishore Bhavan,
17, R. N. Mukherjee Road,
Kolkata - 700 001

তোমার সৃষ্টির পথ

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

জীবনের দিনান্তবেলায় কাছের মানুষ রাণী নির্মলকুমারী মহলানবিশের সঙ্গে একদিন উপনিষদ নিয়ে আলোচনা করছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বৃদ্ধ কবি আরাম কেদারায়। পাশে একটা মোড়া নিয়ে বসে নির্মলকুমারী। বিষয়টা ছিল উপনিষদের 'পিতা নোহসি' মন্ত্র। কেমন করে সেই মন্ত্রের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি আর তাঁর মেজ মেয়ে রেণুকা— বলছিলেন আত্মমগ্ন রবীন্দ্রনাথ। কবি বলতে লাগলেন, ''সেবার রাণীকে কলকাতায় আনার কিছুদিন পরে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে আমাকে বললে— বাবা 'পিতা নোহসি' বলো। আমি মন্ত্রটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার শেষ নিঃশ্বাস পড়ল। ... তার বাবাই যে তার জীবনের সব ছিল। তাই মৃত্যুর হাতে যখন আত্মসমর্পণ করতে হলো, তখনও সেই বাবার হাত ধরেই সে দরজাটুকু পার হতে চেয়েছিল। ... ভগবানকেও পিতা রূপেই কল্পনা করে তাঁর হাত ধরে অজানা পথের ভয় কাটাবার চেষ্টা করেছিল। এই সম্বন্ধের চেয়ে আর কোনও সম্বন্ধ তার কাছে বড় হয়ে ওঠেনি।''

জীবনের মাঝপথে, তেষট্টি-চৌষট্টি বছর বয়সে আজীবন মজবুত স্বাস্থ্যের অধিকারী রবীন্দ্রনাথ যখন প্রায়-প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, তখন যেন নিজের পরলোকগতা মেজো মেয়ের বিশ্বাসের সূত্র ধরে তিনি পৌঁছে যাচ্ছিলেন, 'পিতা নোহসি' মন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে। অজানা ভবিতব্যের অনিশ্চিত পথ পার হতে ঈশ্বরই তখন তাঁর পিতা। তিনি এসে হাত ধরলে বাকি সবকিছু কেমন সহজ, নির্ভার হয়ে যায়।

কিন্তু শেষ অবধি মানুষটির নাম রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বাস আর অবলম্বনের সোজা রাস্তা তো তাঁর রাস্তা নয়। স্নেহের পাত্রী নির্মলকুমারীকে তিনি বলছেন : যেমন অসত্য না থাকলে সত্যের, অন্ধকার না থাকলে আলোর, মৃত্যু না থাকলে অমৃতের মানে নেই,

প্রশান্ত চন্দ্র ও নির্মলকুমারী মহলানবিশ

তেমনই রুদ্র না থাকলে তার প্রসন্নতারও কোনও মানে থাকে না। ... মনকে একেবারে আসক্তিমুক্ত করা বড় সহজ কথা নয়। প্রতিনিয়ত এর জন্য চেষ্টা করতে হয়। নিজের ছোট আমিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বড় আমির মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারলে সে ভারি আরাম।

ইউরোপ থেকে লাতিন আমেরিকার পথে ক্রাকোভিয়া জাহাজে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন রবীন্দ্রনাথ। এযাবৎ দু-একবার ছোটখাটো যেসব শরীর খারাপ হয়েছিল, এই অসুখের সঙ্গে সেসবের তেমন নেই। গভীর সমুদ্রের বুকে কাল্পনিক বিষুবরেখা, জাহাজ তা পার হয়ে চলেছে। এমন সময়ে শরীর গেল বিগড়ে। জ্বর এসে জাপটে ধরেছে দেহ। মাথা তুলতেও কষ্ট হচ্ছে। সমস্ত দিন সমস্ত রাত এক অবর্ণনীয় অস্বস্তি। বিছানায় পড়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছিলেন কবি। মাঝেমাঝে মনে হচ্ছিল, স্বয়ং যমরাজের পায়ের চাপ। কীভাবে পেরোনো যায় এই দুঃসহ অনুভব— ভেবে ভেবে প্রথমদিকে কূলকিনারা পেলেন না। শেষে কাগজ-কলম টেনে নিয়ে শুরু করলেন কবিতা লেখা। কেবিনের বিছানায় আধশোয়া হয়ে তিনি লিখছেন এবং আরও সব অনুভূতিমালার সঙ্গে তাঁকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে মৃত্যু-অনুভব। যেন খুব কাছে এসে পড়েছে মৃত্যু। প্রাণকে বহন করার শক্তিও যেন শেষ হয়ে এসেছে। অসুস্থ শরীরে মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল দেশের হাওয়া বাতাস আর মাটির জন্য। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল, এমন ব্যাকুলতা তো কাজের কথা নয়। যিনি মৃত্যুপথযাত্রী, তাঁকে ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রথা বহুদিন ধরে স্বদেশে চালু আছে। কারণ,ঘরের ভিতরকার সমস্ত অভ্যস্ত জিনিস হচ্ছে প্রাণের বন্ধনজাল। তারা সকলে মিলে মৃত্যুর দিকে আঙুল তুলে প্রতিবাদ করতে থাকে। তাই নিজের বাঁধন আলগা করে দিয়ে মৃত্যুকে সম্পূর্ণ বলে স্বীকার করে নেবার আনন্দটাই চলে যায়। গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে তার হাত ধরে অমৃতের স্বাদ নেওয়ার সুযোগ আর হয় না।

জাহাজ থেকে অসুস্থ শরীরেই প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে একটি চিঠি লেখেন রবীন্দ্রনাথ। লিখলেন : 'ক'দিন শরীর রীতিমতো খারাপ চলছিল। রাতে শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর কথা মনে আসছিল। ... প্রথম দুই-একদিন খুব ইচ্ছা হচ্ছিল দেশে ফিরে যাই। তারপর মনে হল দেশ তো জন্মের জন্য, মৃত্যুর জন্য পথ।'

কেবিনে আধশোয়া হয়ে নিজের এই গভীর উপলব্ধিকেই রূপ দিলেন রবীন্দ্রনাথ 'মৃত্যুর আহ্বান' কবিতায় :

মৃত্যু তোর হোক দূরে নিশীথে, নির্জনে,
হোক সেই পথে যেথা সমুদ্রের তরঙ্গগর্জনে
গৃহহীন পথিকেরই
নৃত্যছন্দে চিরকাল বাজিতেছে ভেরী;

১৯২৪ সালের ৩রা নভেম্বর জাহাজে লেখা এই কবিতার শেষ ক'টি লাইন—

দুয়ার রহিবে খোলা; ধরিত্রীর সমুদ্র-পর্বত
কেহ ডাকিবে না কাছে, সকলেই দেখাইবে পথ।
শিয়রে নিশীথরাত্রি রহিবে নির্বাক,
মৃত্যু সে যে পথিকের ডাক।

জাহাজে যে অসুস্থতা শুরু হয়েছিল, পরে পরীক্ষা করে ডাক্তাররা বুঝতে পারেন তা আসলে ইনফ্লুয়েঞ্জা। এই রোগটিকে বড় ভয় ইউরোপ-আমেরিকার ডাক্তারদের। কবি আর্জেন্টিনা পৌঁছবার পর যখনই তাঁরা তাঁকে পরীক্ষা করেছেন, বলেছেন, ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হওয়ার জন্যই এতখানি দুর্বলতা। দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা করা আপাতত চলবে না। শরীর একটু ভালো হলে তখন নিষেধ কিছু শিথিল করা যেতে পারে। আপাতত নিভৃতে বিশ্রাম ছাড়া গতি নেই।

আর্জেন্টিনার উপকূলে রবীন্দ্রনাথের আন্ডেজ জাহাজ পৌঁছানোর পর রবীন্দ্রনাথকে বিপুল সংবর্ধনা দেন স্থানীয় মানুষজন। বুয়েনস্ আইরেসের প্লাজা হোটেলে উঠেছিলেন অসুস্থ কবি। তত্ত্বাবধানে ছিলেন সচিব এল্‌মহার্স্ট সাহেব। এই সময়েই কবির সঙ্গে দেখা হয় তাঁর চির অনুরাগিনী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর। প্রায় দশ বছর আগে ১৯১৪ সালে আঁদ্রে জিদের ফরাসি অনুবাদে গীতাঞ্জলি পড়েছিলেন ওকাম্পো। অসুখী বিবাহ আর গোপন সম্পর্কের দ্বন্দ্বে তখন তিনি ক্ষতবিক্ষত। ভারতীয় কবির এই আশ্চর্য বই তাঁর জীবনে এক গভীর সান্ত্বনা বয়ে আনল। এর পরে ফরাসি, ইংরেজি বা স্প্যানিশ অনুবাদে যখনই রবীন্দ্রনাথের কোনও রচনা পেয়েছেন, পড়ে ফেলেছেন গোগ্রাসে। ভিতরে, নিজের অজান্তেই শুরু হয়েছিল প্রতীক্ষার প্রহর গোনা। অবশেষে সুযোগ এল, সেদিন তিনি খবর পেলেন পেরু যাবার পথে বুয়েনস্ আইরেসে এসে নেমেছেন রবীন্দ্রনাথ। এক বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে সম্ভবত ৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় ওকাম্পো পৌঁছে যান প্লাজা হোটেলে। খবর পেয়ে হোটেলের নীচের হলঘরে তাঁদের বসানোর নির্দেশ পাঠালেন এলমহার্স্ট সাহেব। তারপর এসে একথা-সেকথার পর উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, কবির হার্টের অবস্থা ভালো নয়, ডাক্তাররা বলছেন আন্ডেস পর্বত পেরিয়ে লিমা যাওয়া তাঁর পক্ষে উচিত হবে না। রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পেরুর প্রেসিডেন্ট। তাই তাঁকেও জানিয়ে দেওয়া দরকার রবীন্দ্রনাথ যেতে পারছেন না।

চুপচাপ শুনছিলেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। হঠাৎ প্রস্তাব করলেন, ডাক্তররা তো বলছেন কোনও গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কিছুদিন থাকার কথা। আমি বরং একটা পুরো বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। আপনারা দুজনে সেখানে এসে থাকুন। জায়গাটার নাম সান ইসিদ্রো।

ভিক্টোরিয়া এলমহার্স্টকে যখন একথা বলছেন, তখনও তিনি

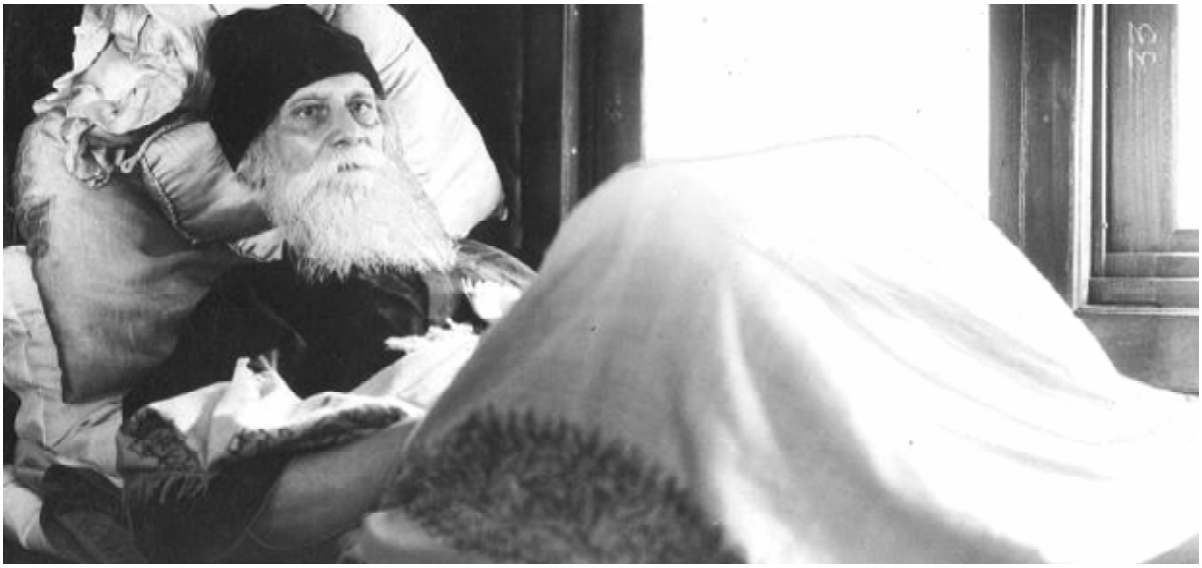

হাওড়া স্টেশনে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ।

জানতেন না সান ইসিদ্রোয় সেই বাড়িটা তাঁর বাবা-মা ছাড়তে রাজি হবেন কিনা। কিন্তু তাঁরা ছাড়ুন না-ছাড়ুন ব্যবস্থা তিনি করবেনই। তাঁর প্রাণের কবির আরোগ্যের জন্য পৃথিবীর যে কোনও জায়গায় যেতে তৈরি ছিলেন ওকাম্পো।

এরপর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম দেখা। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি ওকাম্পোর মনে। রবীন্দ্রনাথের ঘরে ভিক্টোরিয়াকে পৌঁছে দিয়ে অন্য কাজে বেরিয়ে গেলেন এলমহার্স্ট। একটু পরে তিনি এলেন। যেন আবির্ভূত হলেন এক নীরব, সুদূর, তুলনাহীন বিনীত মানুষ। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সেই অবিস্মরণীয় স্মৃতিচারণার অনবদ্য অনুবাদ করেছেন শ্রদ্ধেয় শঙ্খ ঘোষ : 'ঘরে তিনি এসে দাঁড়ালেন, আবার এও সত্যি যে ঘরে যেন তিনি নেই। তাঁর ধরনধারণে একটা ঔদ্ধত্যও ছিল, খানিকটা যেন লামার মতো (ছোটখাটো উটের মতো দক্ষিণ আমেরিকার এক ধরনের প্রাণী)। লামার দিকে কেউ তাকালে ওরা যেমন তাদের তাচ্ছিল্য নিয়ে দেখে, অনেকটা সেইরকম। কিন্তু ওই ঔদ্ধত্যেরই সঙ্গে আছে এক সর্বহারী মাধুর্য।'

বাবা-মা রাজি হননি, তবু সান-ইসিদ্রোয় বাড়ি পাওয়া গেল একটা। ওকাম্পোরই এক আত্মীয়র নতুন তৈরি বাড়ি, নাম 'মিরালরিও'। মাত্র এক সপ্তাহের জন্য হাতে এসেছে। তাই সই। কবিকে নিয়ে ভিক্টোরিয়া চললেন নিরিবিলি গ্রামাঞ্চলের সেই আশ্রয়ের দিকে। সমুদ্রবাতাসের প্রবল ঝাপটায় বুয়েনস্ আইরেসের রাজপথ তখন বিপর্যস্ত। পাক খেয়ে উড়ছে নতুন পাতা, শুকনো ধুলো আর ছেঁড়া কাগজের রাশি। আকাশ কোথাও হলুদ, কোথাও সীসার মতো। বেশ কিছুক্ষণ বাদে যখন তাঁরা এসে পৌঁছলেন সান ইসিদ্রোতে, দৃশ্যপট বদলে গিয়ে কেমন সব ঠাণ্ডা, ছিমছাম। গাছের মাথায় বাতাসের দাপাদাপি অথচ ঘরের ভিতরটা শান্ত, নীরব। ঘরে ঢুকতেই ওকাম্পো রবীন্দ্রনাথকে প্রায় টেনে নিয়ে এলেন প্রশস্ত বারান্দায়। দেখুন কবি এই আকাশ, সামনের ওই নদী, বসন্তের সাজে ভরা প্রান্তর। আপনাকে দেখতেই হবে। মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন রেলিংয়ের কোল ঘেঁষে। সুদূর বিদেশের এই অনাস্বাদিত প্রকৃতিও যেন কত আপনার জন।

প্রথমে ঠিক ছিল থাকবেন সাত-আটদিন। শরীর সারাতে শেষে থেকে যেতে হলো কয়েক মাস। নিশ্চুপ গ্রামাঞ্চল, উদার দিগন্ত আর দূরের নদী কবিকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকত। সঙ্গে ছিল ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর মরমি সান্নিধ্য। মিরালরিওতে থাকতেন না তিনি, রোজ রাতে ঘুমোতে যেতেন বাবা-মায়ের কাছে। দুপুর আর রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতে দিনভর থেকে যেতেন এই বাড়িতে। আরামকেদারায় বিশ্রাম নিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, কাজের ফাঁকে ঘরে ঘুরে এসে তাঁকে দেখে যাচ্ছেন তরুণী ওকাম্পো। মাঝেমাঝে টুকটাক কথাবার্তা। বেশ কিছুদিন পর শান্তিনিকেতন থেকে ওকাম্পোকে চিঠি লিখলেন কবি, তারও কেন্দ্রস্থলে সান ইসিদ্রোর সেই বারান্দা। লিখছেন : 'দেহের এই ভগ্নদশায় থেকে থেকে আমার মন চলে যায় সান ইসিদ্রোর সেই বারান্দাটিতে। মনে পড়ে সকালবেলার আলোয় ভরা বিচিত্র লাল নীল ফুলের উৎসব। আর বিরাট সেই নদীর ওপর নিরন্তর সেই রঙের খেলা, আমার নির্জন অলিন্দ থেকে অক্লান্ত সেই চেয়ে দেখা।'

মিরালরিওর শান্ত সেই ঘর আর বারান্দায় বসে এক এক করে অনেকগুলো কবিতা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পূরবী কাব্যগ্রন্থে সেগুলি সংকলিত হয়ে আছে। তারই দুটি বিশেষ কবিতায় ওকাম্পোর সেই মধুর সান্নিধ্যের স্মৃতি প্রসন্ন কৃতজ্ঞতায় :

১। হে বিদেশি ফুল, যবে আমি পুছিলাম
'কী তোমার নাম'

হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে
নামেতে কী হবে।
আর কিছু নয়,
হাসিতে তোমার পরিচয়।
(বিদেশি ফুল)

২। প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী,
মাধুর্যসুধায়; কত সহজে করিলে আপনারই
দূরদেশি পথিকেরে; যেমন সহজে সন্ধ্যাকাশে
আমার অজানা তারা স্বর্গ হতে স্থির স্নিগ্ধ হাসে
আমারে করিল অভ্যর্থনা; নির্জন এ বাতায়নে
একেলা দাঁড়ায়ে যবে চাহিলাম দক্ষিণ-গগনে
ঊর্ধ্ব হতে একতানে এল প্রাণে আলোকেরই বাণী
শুনিনু গম্ভীর স্বর, 'তোমারে যে জানি মোরা জানি।
(অতিথি)

।। দুই।।

১৯৩৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর সন্ধেবেলায়, বয়স তখন ছিয়াত্তর, আচমকা বড় রকমের অসুস্থ হয়ে পড়লেন রবীন্দ্রনাথ। কবিরাজি ভাষায় এ হলো 'বিসর্প' রোগ, অ্যালোপ্যাথরা বলেন, ইরিসিপেলাস। অসুখটির ডাক্তারি ব্যাখ্যা এরকম :

It is an infection of the upper dermis and superficial lymphatics, usually caused by beta-hemolytic group A streptococcus bacteria on scratches or otherwise infected areas.

স্ট্রেপটোকক্কাস ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এমন হতেই পারে, সেপটিসিমিক শক-এর কবলে পড়ে যান তিনি। এই শক শুরু হয় খানিকটা অতর্কিতে। রোগী বা তাঁর পরিজনদের সচেতন হবার সুযোগ না দিয়েই। প্রায় মাসখানেক পর হেমন্তবালা দেবীকে এক চিঠিতে তিনি লিখলেন : বারান্দায় বসে সুনন্দা সুধাকান্ত আর ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রীকে মুখে মুখে বানিয়ে এক দীর্ঘ গল্প বলছিলুম। বাইরে বাদলা বাতাস, শীত শীত করছিল একটু। গল্প শেষ করে ঘরে গিয়ে আরামকেদারায় বসলুম, শরীরে কোনও কষ্ট নেই। এরই মাঝে কখন যে মূর্চ্ছা এসে আক্রমণ করল, কিছুই জানিনে। রাত ন'টার সময় সুধাকান্ত আমার খবর নিতে এসে আবিষ্কার করলে আমার অচেতন দশা। পঞ্চাশ ঘণ্টা কেটে গেছে অজ্ঞান অবস্থায়, কোনও রকম কষ্টের স্মৃতি মনে নেই।

ওই চিঠিতেই আরও লিখছেন রবীন্দ্রনাথ : কিছুকালের জন্য মৃত্যুদূত এসে আমার ছুটির পাওনা পাকা করে গিয়েছে। মনে করছি আমার ভীষ্মপর্ব শেষ হল। অনবরত তুচ্ছ দাবির শরবর্ষণ আজ থেকে ব্যর্থ হবে। — স্বর্গারোহণ পর্ব পর্যন্ত এরকমই যেন চলে এই কামনা করছি।

স্যার নীলতরন সরকার আর তাঁর সহযোগী ডাক্তারদের অক্লান্ত চেষ্টায় সে যাত্রা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন কবি। কিন্তু এমন এক অভাবনীয় ধাক্কা, তার উপর এনলার্জড প্রস্টেটের উপসর্গে মূত্রাশয়ের কষ্ট কবির শরীরে বড়রকমের প্রভাব ফেলে গিয়েছিল। চোখের সামনে ভেঙে পড়তে লাগল সেই অনিন্দ্যকান্তি। এতটাই যে, আয়নার সামনে দাঁড়াতেও সঙ্কোচ বোধ করতেন কবি। রাণী মহলানবিশকে এই সময়ে এক চিঠিতে লিখছেন : মৃত্যুর ধাক্কা খেয়ে কলকব্জা নড়বড়ে হয়ে গেছে। (আয়নায়) নিজের প্রতিবিম্ব দেখা বন্ধ করে অবারিত কুশ্রীতা ভুলে থাকতে চেষ্টা করি। নরসমাজে এরকম রূপবিকৃতি অসভ্যতা।... দেহটাকে ছেড়ে নিজের নিরাসক্ত মনটাকে নিয়ে আছি।

সত্যিই যেন অন্তিম অধ্যায় শুরু হয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। স্নানের পর ক্লান্তি এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে যে, অনেকক্ষণ কাঁপতে থাকে দু'হাত। কানে আজকাল খুব কম শোনেন, চিনতে কষ্ট হয় পরিচিত মানুষদেরও। মস্তিষ্কের ভেতর কেমন একটা কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব। তবু এরই মধ্যে অবিশ্রান্ত ধারায় চলতে লাগল লেখালিখি। কবিতা, একের পর এক ছড়া, প্রবন্ধ। প্রান্তিক-এর ৯ এবং ১০ নম্বর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার মৃত্যুবোধ হঠাৎ যেন ঝলসে উঠল :

১। দেখিলাম— অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,
চিত্র-করা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়

২। মৃত্যুদূত এসেছিল হে প্রলয়ংকর, অকস্মাৎ
তব সভা হতে। নিয়ে গেল বিরাট প্রাঙ্গনে তব;
চক্ষে দেখিলাম অন্ধকার; দেখিনি অদৃশ্য আলো
আঁধারের স্তরে স্তরে অন্তরে অন্তরে, যে আলোক
নিখিল জ্যোতির জ্যোতি; দৃষ্টি মোর ছিল আচ্ছাদিয়া
আমার আপন ছায়া।

স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে ধীরে ধীরে। তার উপর ১৯৪০ সাল অবধি পরপর প্রিয়জনদের মৃত্যু। একে একে চলে গেলেন জগদীশচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি এফ এন্ড্রুজ, কালীমোহন ঘোষ, সুরেন ঠাকুর। অবসন্ন মনে তবু লেখার কাজ করে চলেছেন তিনি। জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন গান, কবিতা, গল্প। সম্পাদনা করছেন গীতবিতান। ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় ১৯৩৮ সালে ২৫ এপ্রিল রওনা হলেন কালিম্পং। সেখানে এক

মাস থেকে মৈত্রেয়ী দেবীর আমন্ত্রণে মংপু। সেখান থেকে আবার কালিম্পং। অসুস্থ শরীর, চেঞ্জে এসেছেন, কিন্তু লেখার কোনও বিরাম নেই। একের পর এক ভূমিষ্ঠ হচ্ছে কবিতা, যারা পরে স্থান করে নেবে সেঁজুতি এবং নবজাতক বইয়ে। চলছে সানাই এবং খাপছাড়ার কবিতা, চলছে শ্যামা নৃত্যনাট্য। সেবছর জুলাই মাসে শান্তিনিকেতনে ফিরে পরের বছর এপ্রিলে আবার বেরিয়ে পড়লেন রবীন্দ্রনাথ। গন্তব্য এবারে পুরী। কয়েক সপ্তাহ সমুদ্রবাতাসের সান্নিধ্যে কাটিয়ে আবার সেই মংপু। মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্যে।

সুস্থ হবার এত আকাঙ্ক্ষা, তবু শরীর যে কিছুতেই জুতে আসে না। প্রস্টেট আর ইউরিনের কষ্ট। ঠাণ্ডা লেগে মাঝেমাঝে জ্বর আসে। ইদানীং কানেও শোনেন কম।

মৈত্রেয়ী দেবী একদিন কবির পাশে এসে বললেন : আজ তো আপনার শরীরটা বিশেষ ভালো নয় দেখছি।

— এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত। কলটা আজ বিগড়েছে।

— কী করা যায়?

— বিশেষ কিছুই নয়। পায়ের কাছে মোড়াটা অনায়াসে এগিয়ে দেওয়া যায়। আর যদি খুব কষ্ট না হয়, তাহলে চাদরটাকেও পায়ের ওপর চাপা দেওয়া যায়। কান তো প্রায় গেল, কিন্তু সেও সহ্য হবে, শুধু চোখটা না যায়। তাহলে এই আনন্দময় ভুবন তোমাকে কে দেখাবে?

ইরিসিপেলাসের সেই ভয়ঙ্কর শকের পর আবার তিনি বড় অসুখে পড়লেন ১৯৪০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। সেবারেও রবীন্দ্রনাথ কালিম্পংয়ে। সঙ্গে আছেন প্রতিমা দেবী, সচিব সচ্চিদানন্দ রায় আর পুরাতন ভৃত্য বনমালী। পুত্র রথীন্দ্রনাথ জামিদারি দেখতে গেছেন পূর্ববঙ্গে। কোথায় ডাক্তার, কোথায় বা হাসপাতাল। রোগী প্রায় অজ্ঞান, ইউরিন বন্ধ, ইউরেমিয়া হয় হয়। অনেক সন্ধান করে দার্জিলিংয়ের এক ইংরেজ সিভিল সার্জেনকে ধরে আনা হলো। এতবড় নামজাদা রোগী, তিনি এসে নিদান দিলেন, অপারেশনটা এখনই করে ফেলা দরকার। আজ রাতেই।

বাবামশায়ের যে অপারেশনে মত নেই, বিলক্ষণ জানতেন প্রতিমা দেবী। সাহেব ডাক্তারের হাজারো হুঁশিয়ারির পরেও অটল রইলেন তিনি। পরদিন ডা: সত্যসখা মৈত্র সদলবলে কালিম্পয়ে এসে কবিকে গ্লুকোজ ইঞ্জেকশন দিলেন, অনেকখানি ইউরিন হয়ে গেল। এরপর অতি কষ্টে প্রায় অচেতন রবীন্দ্রনাথকে পাহাড় থেকে শিলিগুড়ি নামিয়ে এনে ট্রেনে করে নিয়ে আসা হলো কলকাতায়। জোড়াসাঁকোয় ঢুকলেন ২৯ সেপ্টেম্বর।

রোগশয্যায় কবি। উঠতে পারেন না বড় একটা। বড় বড় ডাক্তারদের আনাগোনা বেড়ে গেল জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। আসছেন স্যার নীলরতন সরকার, আসছেন বিধান রায়। নীচু গলায়

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

পরামর্শ চলে, কী করে সুস্থ করা যায় এই সেনসিটিভ রোগীকে। নিজের হাতে লিখতে পারছেন না বলে সৃষ্টি কিন্তু মোটেই বন্ধ হয়নি রবীন্দ্রনাথের। মুখে মুখে বলে যান কবিতা। দ্রুত হাতে লিখে নেন সেবিকারা। কখনও রাণী চন্দ, কখনও প্রতিমা দেবী, কখনও বা নির্মলকুমারী। এভাবেই একদিন জন্ম দিলেন এই কবিতাটির—

ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যাত্রার সময় বুঝি এল,
বিদায়দিনের পরে আবরণ ফেলো
অপ্রগল্‌ভ সূর্যাস্ত আভার;
সময় যাবার
শান্ত হোক, স্তব্ধ হোক, স্মরণ সভার সমারোহ
না রচুক শোকের সম্মোহ।
(আরোগ্য)

কবির সাহিত্য সচিব ও বিশ্বভারতীর অধ্যাপক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত স্মৃতিচারণ করেছেন রোগজীর্ণ রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের কোনও এক দিনের :

শান্তিনিকেতনে তখন চলছে গরমের ছুটি। ছেলেমেয়েরা নেই, অধ্যাপকরাও অনেকেই চলে গেছেন। নীরব নিঃসঙ্গ সেই শান্তিনিকেতনে উদয়নের একতলায় শয্যাশায়ী কবি। উঠতে বসতে পারেন না, কানে খুব কম শোনেন, মানুষও চিনতে পারেন অতি কষ্টে। নন্দগোপাল পায়ের কাছে একটা মোড়া নিয়ে বসলেন। আস্তে আস্তে হাত বুলাতে লাগলেন দুই পায়ে। দেখলেন, বেশ ফুলেছে পা দুটো। কবি যেন বুঝলেন ব্যাপারটা। পাণ্ডুর মুখে দেখা দিল এক টুকরো হাসি। বললেন, 'মরণ চরণে শরণ নিয়েছে। তাকে

আর বিমুখ করব না হে।' কান্না চেপে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন নন্দগোপাল সত্যি তো, আর যে দেরি নেই!

।। তিন।।

অসুখ যেন ধাপে ধাপে আরোগ্যহীনতার দিকে এগিয়ে চলেছে। শান্তিনিকেতনে থাকুন, অথবা জোড়াসাঁকোয়— প্রতিদিনই ঘুরে ঘুরে আসছে জ্বর। কখনও ৯৮, কখনও ৯৯, প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা বেড়ে গেলে ১০০-ও পেরিয়ে যাচ্ছে শরীরের তাপমাত্রা। ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনের উদয়ন বাড়িতে তাঁর চুল কেটে ছোট করে দেওয়া হয়। দীর্ঘ রোগযন্ত্রণায় পাণ্ডুর মুখ, শিথিল অবসন্ন ত্বক, মাথার সামনের দিকে টাক পড়েছে। অনেকটা যেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শেষ বেলাকার আদল। ১৯৪১ সালের ৮ মে তাঁর জীবনের শেষ পঁচিশে বৈশাখও কাটল অস্থিরতায়। ভালো ঘুম হচ্ছে না। নিজে থেকেই বায়োকেমিক ওষুধ কালি ফস্ খেলেন, ওডিকোলন মাথায় দিলেন— একটু যদি স্বস্তি পাওয়া যায়। এরই দু-একদিন পর শান্তিনিকেতনে অসুস্থ কবির সঙ্গে দেখা করতে এলেন সস্ত্রীক বুদ্ধদেব বসু। তাঁর চোখে কবির এই রূপ যেন আশ্চর্য এক মহনীয়তায় বিস্তারিত হয়ে গেছে। বর্ণনা দিচ্ছেন বুদ্ধদেব বসু : 'মুখ তাঁর শীর্ণ। আগুনের মতো গায়ের রঙ ফিকে হয়েছে, কিন্তু হাতের মুঠি কি কব্জির দিকে তাকালে বিরাট বলিষ্ঠ দেহের আভাস এখনও পাওয়া যায়। কেশরের মতো যে কেশগুচ্ছ তাঁর ঘাড় বেয়ে নামত, তা ছেঁটে ফেলা হয়েছে। কিন্তু মাথার মাঝখান দিয়ে দ্বিধাবিভক্ত কুঞ্চিত শুভ্র দীর্ঘ কেশের সৌন্দর্য এখনও অম্লান। ... এর জন্য এই বয়সের ভার আর রোগ দুঃখ ভোগের দরকার ছিল।'

হয়তো সত্যিই বলেছেন বুদ্ধদেব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই রোগভোগ এমনই নাছোড় আর নিষ্করুণ যে ইহজন্মে তার থেকে পরিত্রাণ মিলল না। প্রস্টেটের জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্যের সীমার ছাড়াচ্ছে বারবার, সারাদিন আধো ঘুম আধো জাগরণের অবস্থা। সারা রাতও। তবু জাত-স্রষ্টা বলেই হঠাৎ হঠাৎ তিনি বলে উঠতেন, লিখে নাও।

এই বয়সে তাঁর শরীরে সুপ্রা পিউবিক সিস্টোস্টমির মতো ছোট অপারেশনও করা উচিত কিনা তাই নিয়ে সেকালের দিক্‌পাল ডাক্তররা দু'দলে ভাগ হয়ে যান। অপারেশন চাইছিলেন না রবীন্দ্রনাথ, চাননি স্যার নীলরতন সরকার। কিন্তু ভীষণভাবে চাইছিলেন বিধান রায় এবং আরও কয়েকজন চিকিৎসক। টানাপোড়েনে পড়ে কিছুতেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না কবির একমাত্র জীবিত সন্তান রথীন্দ্রনাথ। এইভাবেই কাটছিল দিন।

এমনই এক দিন ১৯৪১ সালের ১৩ মে। কিছুদিন আগে পেরিয়ে গেছে কবির জীবনের শেষ পঁচিশে বৈশাখ। গায়ে জ্বর আর মাথায় যন্ত্রণা নিয়ে রোগশয্যায় শুয়ে তিনি। এমন ঘোর লাগা অবস্থাতেই অকস্মাৎ বলে উঠলেন :

রূপনারায়ণের কূলে জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়।

সেবিকারা পাশেই ছিলেন, ছিল কাগজ কলমও। কেউ একজন লিখে নিলেন দ্রুত হাতে। এটুকু বলেই হাঁফ ধরে যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের। কথা খুঁজছেন। খানিক পরে আবার বলতে শুরু করলেন :

রক্তের অক্ষরে দেখিলাম / আপনার রূপ
চিনিলাম আপনারে / আঘাতে আঘাতে / বেদনায় বেদনায়;

শরীরে বড় কষ্ট। ক্লান্তিতে চোখ বুজছেন কবি। ঘুমিয়েও পড়লেন। হঠাৎ জেগে উঠলেন সন্ধে সোয়া ছ'টা নাগাদ। এপাশে ওপাশে তাকিয়ে বলে উঠলেন বাকিটা লেখো। সেবিকা হিসাবে রাণী চন্দের ডিউটি তখন :

সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালবাসিলাম,
সে কখনও করে না বঞ্চনা
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

কবিতাটা শেষ করে কিছুক্ষণের জন্য যেন নিঃশেষ হয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। ঘুমিয়ে পড়লেন। জগৎ পরে জানল, তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী আবারও কি এক আশ্চর্য কবিতার জন্ম দিয়েছে।

দেখতে দেখতে আরও দু'মাস কাটল। নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর ডাক্তাররা মোটামুটি বলেই দিয়েছেন অপারেশন হচ্ছেই। বিপদ হল, সেই ৪০-৪১ সালে পেনিসিলিনের মতো প্রাথমিক স্তরের অ্যান্টিবায়োটিকও আবিষ্কার হয়নি। রবীন্দ্রনাথের মতো রোগীর শরীরে অস্ত্রোপচারের ধকল কতটা সইবে, কোনওভাবে ইনফেকশন এসে পড়বে কিনা, যদি আসে কী তার প্রতিকার— এসব ব্যাপারে কেউই নিশ্চিত ছিলেন না। তবু কবিকে 'রিলিফ' দেওয়ার তাগিদটা ক্রমশ এত বড় হয়ে উঠছিল যে, শেষপর্যন্ত রথীন্দ্রনাথ মত দিয়ে দিলেন। মত ছিল না স্যার নীলরতনের, যে মেডিকেল বোর্ড কবির অস্ত্রোপচারের জন্য গঠিত হলো তা থেকে সরিয়ে নিলেন নিজেকে।

২৭ জুলাই, ১৯৪১। দু'দিন আগে স্ট্রেচারে করে জোড়াসাঁকোয় আনা হয়েছে কবিকে। শান্তিনিকেতন থেকে সেই তাঁর শেষযাত্রা। হাওড়ায় ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনেই স্ট্রেচারে শোয়ানো হলো তাঁকে। পথের ধকলে এত কাহিল হয়ে পড়েছিলেন যে, বাড়ি পৌঁছেও স্ট্রেচারেই শুয়ে রইলেন। ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের ঘর আগে থেকে খালি করে ফেলা হয়েছে অপারেশন হবে বলে। সরিয়ে দেওয়া হয়েছে পূর্বপুরুষদের বাঁধানো ছবি। চারদিক লাইজল

দিয়ে ধুয়ে মুছে ঝকমকে। কবির ঠাঁই হলো মহর্ষি ভবনের দোতলার পাথরের ঘরে। অস্ত্রোপচারের প্রস্তুতি হিসাবে আসা-যাওয়া চলছে ডাক্তারবাবুদের। ২৬ জুলাই বিকেলের দিকে আবার শরীর খারাপ। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর উঠল ১০২.৪। চাপাচুপি দিয়ে রাখার খানিকক্ষণ পর আচ্ছন্ন অবস্থায় কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদিন রবিবার ২৭ জুলাই ভোর হতে না হতেই ফের আবির্ভাব কবিতার!

ডিউটিতে তখন ছিলেন রাণী চন্দ। রবীন্দ্রনাথ একটু যেন অস্থির। হাতটা তুলে বললেন, কয়েকটা লাইন এসেছে মাথায়। লিখে নে। নয়তো হারিয়ে ফেলব। রানী চন্দ কাগজ-কলম নিয়ে ঝুঁকে পড়ে লিখতে লাগলেন—

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—

থেমে গেছেন কবি। কী যেন ভাবছেন তন্ময় হয়ে। তারপর আবার বলেন—

কে তুমি।
মেলেনি উত্তর।

আত্মগত ভাবে তিনি বলছেন : প্রতিবারই ভাবি ঝুলি খালি হয়ে গেল। এবার চুপচাপ থাকি। কিন্তু পারিনে। লিখে রাখ—

বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়
কে তুমি।
পেল না উত্তর।

লেখা শেষ। কবির মুখে শিশুর মতো হাসি। মৃত্যুর এত কাছাকাছি পৌঁছেও একের পর এক নতুন কবিতার জন্ম দিয়ে চলেছেন যিনি, তিনি কি কোনও সাধারণ মানুষ? নিজেই বলছেন, 'এটা পাগলামি না তো কি? এর কি কোনও শেষ নেই?'

শেষ বোধহয় সত্যিই নেই। ২৯ জুলাই সন্ধেবেলা রাণী মহলানবিশরা জোড়াসাঁকোয় এসে শোনেন, বিকেলবেলা নাকি আরও একটা কবিতা হয়েছে। শেষ লেখার সেই বিখ্যাত ১৪ নম্বর কবিতা—

'মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে'

সাতাত্তর বছর কেটে গেছে, রবীন্দ্রনাথ নেই। তবু তাঁকে নিয়ে আজও বিস্ময় কাটে না আপামর বাঙালির। রোগশয্যায় শুয়েও যিনি ভাবতে শেখাচ্ছেন, ভাষা জোগাচ্ছেন গোটা একটা জাতিকে। মৃত্যুর গুহা থেকে অমৃতময় আলোর দিকে তাঁকে হাত ধরে নিয়ে যাবেন পরম পিতা, সেই তো স্বাভাবিক। বাইশে শ্রাবণের কান্নাভেজা দুপুরে কবির হৃদ্‌স্পন্দন যখন নিভু নিভু, উষ্ণতা কমে আসছে হাত-পায়ের, বাইরের বারান্দায় বসে কারা যেন গান ধরল— কে যায় অমৃতধাম যাত্রী। জনতার কোলাহল ছাপিয়ে মন্ত্র কণ্ঠে উচ্চারিত হতে লাগল—

বাবামশায়ে'র একান্ত নিজস্ব মন্ত্র—
শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্।

ঋণ : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত কুমার পাল, নির্মলকুমারী মহলানবিশ, রাণী চন্দ, মৈত্রেয়ী দেবী, শঙ্খ ঘোষ, অমিতাভ চৌধুরী।

Kedia Fabrics

Kamal Kumar Kedia

Mfg. & Dealer of Fancy Sarees

160, Jamunalal Bazaz Street, 2nd Floor,

Kolkata-700 007 (s) 2272-5487

Mob : 9331105467

AVIMA EXPORTS (P) LTD.

Exporters of Quality Jute Goods & Rice

91A/1, Park Street, Office No - 2
Kolkata-700 016
Phone : 40050050 / 51
Fax : 2243 2659, 40050071
e-mail : info@juteonline.com

With
Best
Compliments
From-

S. K. KAMANI

KHIMJEE HUNSRAJ

Head Office : 9, Rabindra Sarani,
Kolkata - 700 073
Tel. : (033) 2235-4486 / 87 / 88
3292-4221
Fax : 2221-5638
E-mail : office@khimjee.com
Web Site : www.khimjee.com

অন্ধকারের গল্প

গোপাল চক্রবর্তী

বার দুই কলিং বেল টিপতেই জ্যাঠামশাই নিজেই দরজা খুলে দিলেন। এই সময়ে উড়িয়া ভূতনাথ ঠাকুর দেশোওয়ালি ভাইদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে শান্তিনাথতলায় যায়। ঝি গঙ্গাদি একগাল পান খেয়ে নাক ডেকে ঘুমায় আর আমি জ্যাঠামশাইকে বই পড়ে শোনাই। এটাই আমার কাজ। আরও দু'একটা কাজ আমাকে করতে হয়। যেমন, জ্যাঠামশাইয়ের টালিগঞ্জের বাড়ির চারঘর ভাড়াটের ভাড়াটা প্রতি মাসের পাঁচ

তারিখে গিয়ে নিয়ে আসা। নীচের দুটো দোকানের ভাড়া নিয়ে রসিদ দেওয়া। টাকা জমা দেওয়া এবং তোলার জন্য ব্যাঙ্কে যাওয়া। আর মাঝে মাঝে কলেজ স্ট্রিট থেকে নতুন বই কিনে আনা। আজ পাঁচ তারিখ, তাই আমি গিয়েছিলাম টালিগঞ্জের বাড়ি থেকে ভাড়া তোলার জন্য।

— কী হলো, এতো দেরি হলো যে?

— রাস্তায় জ্যাম ছিল, মিছিল বেরিয়েছে।

— এই মিছিল করে করেই তো দেশটা গেল।

— এ আবার অন্য মিছিল।

আমি টাকার প্যাকেটগুলো জ্যাঠামশাইয়ের হাতে দিলাম। তিনি টাকাটা গুনে আলমারির লকারে রেখে বললেন— কী রকম মিছিল?

— বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময় যারা খুন-ধর্ষণ লুণ্ঠনে অভিযুক্ত ছিল, তাদের হাসিনা সরকার বিচার শুরু করেছে। বিশেষ আদালত পাঁচ অভিযুক্তকে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে, তার প্রতিবাদে মুসলিম মৌলবাদীরা শহিদ মিনারে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছে, চারদিক থেকে মিছিল আসছে, তাই যানজট।

— আমাদের সরকার এই সমাবেশের অনুমতি দিল?

— শুধু অনুমতি কেন, বিক্ষোভকারীদের নিরাপত্তার জন্য প্রচুর পুলিশি ব্যবস্থাও করেছে।

— শুভময়, এ কোন দেশে আছি আমরা? বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময় এরা তিরিশ লক্ষ মানুষ মেরেছিল। কুড়ি লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করেছিল। আজ তাদের শাস্তি হচ্ছে বলে এখানে প্রতিবাদ? সরকারি মদতে?

— ওরা তো স্বাধীনতার শত্রুদের শাস্তি দেবার মতো সাহস দেখিয়েছে বলুন। যা আমাদের প্রশাসন পারে না।

— কী করে পারবে বলো? ভোট যে বড় বালাই। ভোটভিখারি দল, ভোটের জন্য যে এরা সব সময় হাত জোড় করে রয়েছে। সে যে দলই হোক। যাক, তুমি কিছু খেয়ে নাও।

— আমি তো খেয়েই বেরিয়েছিলাম।

— ও, তা জলটল খেয়ে নাও।

— ঠিক আছে, নিচ্ছি। আপনি আজ কী শুনবেন? বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ শুরু করার কথা ছিল আজ।

— থাক, শুভময়। তোমার কাছে খবরটা শুনে আমার মনটা বড় অস্থির হয়ে গেল। আজ আর কিছু শুনতে ইচ্ছে করছে না। আজ বরং আমি বলি, তুমি শোনো।

কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল। জ্যাঠামশাই কী যেন ভাবছেন, চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা। জ্যাঠামশাইয়ের নাম মণিশঙ্কর গাঙ্গুলি। বয়স আশি বছর হলেও শক্ত সমর্থ মানুষ। আমি দু'বছর এ বাড়িতে আছি। কোনওদিন জ্যাঠামশাইয়ের জ্বরজারি হতে দেখিনি। এই বয়সেও সব চুল পাকেনি। তবে দৃষ্টিটা কম, চশমাতেও কাজ হয় না। কিন্তু স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। জ্যাঠামশাই আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন কেমন ঝাপসা দৃষ্টিতে। বললেন, — আচ্ছা শুভময়, তুমি এতদিন এই বাড়িতে আছ, তোমার কখনও জানতে ইচ্ছে করেনি, এতবড় বাড়িতে আমি একা কেন? আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই কেন?

— জ্যাঠামশাই, এই প্রশ্নটা যে আমার মনে আসেনি তা নয়। তবে বেশি কৌতূহল হয়তো ধৃষ্টতা হবে, তাই চুপ করেই ছিলাম।

আরও কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল। জ্যাঠামশাই কথা বললেন—

— এই যে বাড়িটা দেখছ, এটা একদিন জমজমাট ছিল। আজ থেকে ৬০ বছর আগে আমার বয়স তখন ২০, বি-এ পাশ করেছি। বাবা জয়শঙ্কর গাঙ্গুলি হাইকোর্টের উকিল। দাদা উমাশঙ্কর সদ্য এল এল বি পাশ করে বাবার জুনিয়র হয়েছে। বছরখানের আগে দাদার বিয়ে হয়েছে। বৌদি অসাধারণ সুন্দরী। আমার এক বোন ছিল রত্না, সেবার ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে। মায়ের ইচ্ছে ছিল তার বিয়ে দেবেন। কিন্তু বোন বায়না ধরেছে সে আরও পড়বে। বাবার ইচ্ছায় সে ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হলো। তার কলেজে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে আমি মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে বাবাকে রাজি করিয়ে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাকে ভর্তি করেছিলাম। আমাদের ভাই-বোনদের মধ্যে রত্না ছিল সবচাইতে মিশুকে। দিন কয়েকের মধ্যে ভিক্টোরিয়ায় অনেক বান্ধবী জুটিয়ে ফেলেছিল সে। তাদের একজন কাবেরী। কাবেরী মুখার্জি। বর্ধমানের এক জমিদারের মেয়ে। সে থাকত ভিক্টোরিয়া কলেজের হোস্টেলে। রত্না মাঝেমাঝে কাবেরীকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসত। কাবেরী বাড়িতে এলেই আমাদের বাড়িটা যেন হাসি-ঠাট্টা, গানে, গল্পে মুখর হয়ে উঠত। আমার রাশভারী বাবা, গোমড়ামুখো দাদা, জাঁদরেল মা, সবাই কাবেরীর কাছে সহজ সরল হয়ে উঠত। শুধুমাত্র বৌদি একটু ব্যতিক্রম ছিল। বৌদির একটু রূপের গুমোর ছিল। কিন্তু কাবেরী ছিল বৌদির থেকেও সুন্দরী। মা একদিন কাবেরীর চিবুক ধরে বলে ফেললেন—

—আমার মেয়েটাকে আমি কলেজে পাঠাতে চাইনি, এখন দেখছি মেয়ে কলেজে না গেলে আর একটা মেয়েকে আমি পেতামই না।

একদিন রত্না আমার ঘরে এসে বেশ গাম্ভীর্য নিয়ে বলল— আচ্ছা ছোড়দা, কাবেরীকে তোমার কেমন লাগে?

— মন্দ না।

— পছন্দ হয় তো বল। ঘটকালি করি, বাবামায়ের নিশ্চয় আপত্তি থাকবে না।

—খুব পাকা হয়েছ না! মারবো চাটি, বুঝবি ঠেলা।
রত্না সেদিন পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে মণিশঙ্করের মনের কথাটা বুছে গিয়েছিল। একদিন মা সুভদ্রা বাবা জয়শঙ্করের কাছে গিয়ে বললেন—
— এই কাবেরী মেয়েটাকে আমাদের বাড়ির ছোট বৌ করে আনা যায় না?
— কথাটা যে আমিও ভাবিনি তা নয়। আমি খবর নিয়েছি, ওরা আমাদের পাল্টি ঘর, জমিদার বংশ। তবে ছোটখোকা তো এখনও কিছু উপার্জন করে না।
— তাতে কী হয়েছে? উপার্জন না করলে ওদের খাওয়া জুটবে না নাকি?
— না, না। ব্যাপারটা তা নয়। এখনকার দিনের ছেলেমেয়ে, ওরা স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায়।
— তা তুমি পারো না ছোটখোকার একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে?
— তা পারবো না কেন? কিন্তু তোমার ছেলে কি এখন বিয়ে করবে? সে তো এম-এ-তে ভর্তি হবে বলছে। সে তো বলেই দিয়েছে প্রফেসরি ছাড়া অন্য কোনও কাজ সে করবে না।
— যাই বলো বাপু, এ মেয়েটাকে আমি হাতছাড়া করতে পারবো না। আচ্ছা, এমন হয় না যে ওরা দুজনেই পড়াশুনা করুক, পাশ করুক, তারপর না হয় বছর— হ্যাঁ গো এম-এ পাশ দিতে কত দিন লাগে?
— তা ধরো দু'বছর। আর পাশ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তো চাকরি পাবে না। সময় লাগবে, অতদিন ওরা অপেক্ষা করবে কেন?
— করবে, করবে। আমার ছেলে ফেলনা নাকি? আমরা কাবেরীর বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলে নেব।
— দেখো, ওরা জমিদার মানুষ। আমাদের মতো ছাপোষা ঘরে মেয়ে দিতে রাজি হবে কিনা!
— তুমিই বা কম কিসে? এনিয়ে কাবেরীর বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলা দরকার। ওদের কাছে একটা পত্র লিখলে কেমন হয়?
— হাঁ, তা অবশ্য লেখা যায়।
— আমার ভয় ছিল, আমার রতনটা শ্বশুর ঘরে চলে গেলে বাড়িটার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকটাও বুঝি ফাঁকা হয়ে যাবে। তার আগেই আমি কাবেরীকে এবাড়িতে নিয়ে আসব। মেয়েটার কাজকম্ম দেখেছ? সেদিন কেমন মাছের টক করে খাওয়ালো?
— হ্যাঁ, ওটা ওদের বর্ধমানের রান্নার বিশেষ পদ।
সেদিন কলেজ থেকে ফিরে রত্না সটান এসে গেল মণিশঙ্করের ঘরে, বেশ আদেশের সুরে বলল—
— ছোড়দা শোন, আগামী রোববার কোনও কাজ রাখবে না।
মণিশঙ্কর অবাক হয়ে বলল— কেন?
— শনিবার কাবেরী আমাদের বাড়িতে আসবে, ও কোনওদিন চিড়িয়াখানা দেখেনি, ওকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় যেতে হবে।
— পারবো না। আমি কারও হুকুমের চাকর নই। অর্ডার করল আর আমি ছুটলাম।
— এই ছোড়দা, তুমি এমন গোঁয়ারের মতো কথা বলছ কেন? কাবেরী বাড়িতে এলে সেদিন তো বাড়ি থেকে নড়তে চাও না। কারণে অকারণে আমার ঘরে উঁকিঝুকি মারো...
মণিশঙ্কর এবার সত্যি রেগে যায়। বলে— শোন্ খুকু, তুই যা-তা বলবি না বলে দিলাম।
— হুঁ, সত্যি বললে যা তা বলা হয় না? ঠিক আছে যাবে না তো যাবে না। আমরা নিজেরাই যাবো।
রাগে গজ্‌গজ্ করতে করতে চলে গেল রত্না। শনিবার কলেজ ছুটির পর কাবেরী এল রত্নার সঙ্গে। সেদিন কংগ্রেস অফিসে একটা মিটিং থাকলেও ইচ্ছে করেই মণিশঙ্কর যায়নি। এক বন্ধু ডাকতে এসেছিল, বলেছে শরীর খারাপ। দুপুরে ঘুমোতেও পারেনি খোলা জানালা দিয়ে বারবার গেটের দিকে তাকাচ্ছিল। বিকেলের দিকে একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল গেটের সামনে। গাড়ি থেকে নামল রত্না আর কাবেরী। মা এগিয়ে গিয়ে নিয়ে এলেন। রত্নার ঘরে ব্যাগটা রেখে কাবেরী সোজা চলে এল মণিশঙ্করের ঘরে। মণিশঙ্কর তখন শুয়ে শুয়ে একটা ইংরেজি ম্যাগাজিন পড়ছিল। কাবেরী ম্যাগাজিনটা তুলে নিয়ে টেবিলে রাখল। দু'হাত কোমরে রেখে ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল— এই যে মশাই, রতন আপনাকে বলেছিল রবিবার দিন আমাদের চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে। আপনি বলেছেন, আপনি কারও হুকুমের চাকর নন। কি, বলেছেন কিনা?
— আমি, কই না তো। আমি আবার কবে এই কথা বললাম। রত্না বলেছে বুঝি? মিথ্যে কথা বলেছে, ও না ভীষণ মিথ্যা কথা বলে। ওর কোনও কথা বিশ্বাস করবেন না। মিথ্যেবাদী একটা।
এতক্ষণ হয়তো আড়ালে ছিল রত্না। এবার সামনে এসে বলল— কে মিথ্যেবাদী?
— না, মানে ঐ...
— বলো, বলো, কে মিথ্যেবাদী?
— না, না। মিথ্যেবাদী কেউ না। ওই একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে আর কী। চলো আমরা অপোশ করে নিই।
— কাল সকাল ন'টার মধ্যে রেডি হয়ে থাকবেন। দ্বিতীয়বার যেন বলতে না হয়।
কাবেরী যেমন এসেছিল, তেমনি চলে গেল। রত্না বেরিয়ে যাওয়ার সময় মণিশঙ্কর হাত ধরে থামাল। বলল— তুই আমাকে এভাবে ফাঁসিয়ে দিলি?
— দাঁড়াও না, সবে তো শুরু।

বলেই ছুটে বেরিয়ে গেল রত্না। পরদিন সবাই হৈহৈ করে চিড়িয়াখানায় গেল। বৌদির প্রথমে যাওয়ার কথা থাকলেও যাবার সময় প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা শুরু হলো। তাই যাওয়া হলো না। রত্না মুখ টিপে হাসল। কাবেরী জোর করে নিয়ে গেল মা-কে। সেদিন রাতে কাবেরী বলল— মেসোমশাই, বাবা-মা দুজনেই বলেছেন আপনি আর মাসীমাকে আমাদের বাড়ি যাবার জন্য, কবে যাবেন বলুন?

জয়শঙ্কর বললেন— দেখছো তো মা, আমার ছুটি কোথায়? ছুটির দিনেই কাজ বেশি। তুমি বাবা মাকে আমার হয়ে বলো, উনারা যেন দয়া করে একবার আসেন। এবাড়িতে পায়ের ধুলো দেন। আমি বরং একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি।

কাবেরী বলল— বাবা বলছিলেন হাইকোর্টে একটা মামলার জন্য আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। বাবা আপনার নাম শুনেছেন।

— তাহলে তো ভালোই হয়, রথ দেখা কলা বেচা দুটো একসঙ্গে হয়ে যাবে।

বাড়ির ছাদের মণিশঙ্করের ছোট একটা বাগান আছে। টবে ছোট ছোট গাছ সব, বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, গোলাপ। মণিশঙ্কর গাছের পরিচর্যা করে আর রোজ রাতে সেই বাগানে কিছুক্ষণ বসে। তারপর শুতে যাওয়া। সেই রাতেও একা বসেছিল মণিশঙ্কর। বিকেলে কাবেরী এসেছে রত্নার সঙ্গে হোস্টেল থেকে। সন্ধ্যায় ইতিহাসের পড়া বুঝতে গিয়ে মণিশঙ্করের সঙ্গে কিছুক্ষণ তর্ক করল। খাওয়ার আগে মায়ের ঘরে বসে মায়ের সঙ্গে অনেক গল্প। মায়ের ঘরে রত্নার মতোই অবাধ অধিকার কায়েম করে নিয়েছে ইতিমধ্যেই। খাওয়ার পর বাবার ঘরে। আমরা ভাই-বোনেরা বাবাকে ছোটবেলা থেকেই ভয় করে এসেছি। কাছে ঘেঁষার সাহস করিনি। সেখানে কাবেরীর ছিল অবাধ গতি। একদিন বাবার জন্য একটা পাইপ এনে তাতে তৈরি তামাক পুরে, বাবার ঠোঁটে লাগিয়ে বলল— মেসোমশাই এখন থেকে এটা, ওই বুড়োদের মতো গড়গড়া আর চলবে না।

— এই বয়সে আবার এসব কেন মা? আর আমি তো বুড়োই—

— নো, নো। ইউ আর এভারগ্রিন মেসোমশাই।

— দূর পাগলি।

বাবা রত্নার সঙ্গেও এতটা সহজ কোনওদিন হননি। পেছনে কাদের মৃদু পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। মণিশঙ্কর জানে নিশ্চয় রত্না আর কাবেরী। ঠিক মণিশঙ্করের পেছনে এসে দাঁড়াল ওরা।

কাবেরী বলল— ওঃ কি মিষ্টি গন্ধ। এটা কী ফুল রে?

— আমি নাম জানি না। ছোড়দা জানে।

— বলতে পারছেন না এটা কী ফুল?

— দুটো ফুল এখন গন্ধ ছড়াচ্ছে, একটা বেল আর একটা গন্ধরাজ।

কেউ কোনও কথা বলে না। পাশের গাছের ডালে একটা 'বউ কথা কও' অবিরাম ডেকে চলেছে। রত্না বলল— তুই একটু দাঁড়া কাবেরী, আমার বড্ড জল তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খেয়ে আসছি।

— চল আমিও যাচ্ছি।

— আরে বাবা দু'মিনিট দাঁড়া না, ঘরে গুমোট।

কাবেরীকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে রত্না দ্রুত চলে গেল। মণিশঙ্কর বলল— কী ভয় করছে?

— সে তো আপনারই করার কথা। আমাকে দেখলে তো আপনার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যায়।

— কে বলল?

— আমি দেখেই বুঝতে পারি।

— সব বুঝতে পারেন?

— হ্যাঁ।

— তাহলে বলুন দেখি আমি মনে মনে এখন কী ভাবছি?

— এ তো খুব সোজা। আপনি ভাবছেন এই আপদটা এখান থেকে গেলে বাঁচি।

— ছাই বুঝেছেন।

— এই শুনুন, আপনি আমাকে, আপনি আজ্ঞে করবেন না তো। ভালো লাগে না।

— ঠিক আছে, তাহলে তুমিও আমাকে তুমি বলবে।

— বলবো, ধীরে ধীরে।

— কাবেরী।

— কী?

মণিশঙ্কর আবেগে কাবেরীর হাত দুটো ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল— তুমি আসবে তো আমার ঘরে? বলো—

— তুমি ডাকলেই আসব।

— শুধু আমি নই, আমাদের বাড়ির সবাই চাইছে তুমি আমাদের বাড়িতে বউ হয়ে এসো।

সিঁড়ি দিয়ে ধুপধাপ শব্দ করে উঠে আসছে রত্না। ওরা দুজন সরে গেল।

রত্না বলল— খুব তাড়াতাড়ি এসে পড়েছি বলো?

— দাঁড়াও তোমার পাকামো বের করছি।

— জানো ছোড়দা, কাবেরী খুব ভালো গান করতে পারে, রবীন্দ্র সঙ্গীত।

— নাগো।

— গাও না একটা গান।

— গা নারে।

কাবেরী গাইল— খুব ধীরে ধীরে...
আজি জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে...

অ্যাডভোকেট জয়শঙ্কর গাঙ্গুলির চিঠি পেয়ে বর্ধমানের জমিদার বিনোদ বিহারী মুখার্জি গাড়ি নিয়ে সটান চলে এলেন মানিকতলায়। সঙ্গে স্ত্রী সুধাময়ী, কন্যা কাবেরী। রবিবার, কোর্ট নেই তবে চেম্বারে মক্কেলের ভিড়। তবুও ফাঁকে ফাঁকে উঠে এসেছেন উকিলবাবু। অতিথি

আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি নেই। এক সময়ে পাইপ টানতে টানতে উকিলবাবু এলেন সব মক্কেল বিদায় করে।
বললেন— মেয়ের কাণ্ড দেখুন। আমাকে হুঁকো ছাড়িয়ে পাইপ ধরিয়ে দিয়েছে।
— আমি তো ভেবে পাচ্ছিলাম না এই পাইপ দিয়ে ও করবেটা কী? আমাদের ম্যানেজারকে দিয়ে পার্ক স্ট্রিটের সাহেবের দোকান থেকে পাইপটা কিনিয়েছে। তবে আমি কোনও প্রশ্ন করিনি। কারণ আমার মেয়ের উপর আমার বিশ্বাস আছে। আমি জানি, ও যা করবে ঠিক কাজই করবে।
বৈঠকখানার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল মণিশঙ্কর, উকিলবাবু ডাকলেন— মণি, একবার শুনে যাও।
মণিশঙ্কর এলে উকিলবাবু বললেন— এ আমার ছোট ছেলে মণিশঙ্কর। এবার বি-এ পাশ করল।
— হ্যাঁ, ওর সাথে আলাপ হয়েছে। ও ইতিহাস নিয়ে এম-এ পড়তে চায় শুনে আমার খুব ভালো লেগেছে। আমাদের সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে, ইতিহাস বিকৃত হচ্ছে, এসব রক্ষা করা দরকার। আমার অল্প বয়সে বাবা চলে গেলেন, জমিদারির হাল ধরতে গিয়ে পড়াশুনায় বেশি এগুতে পারিনি। তাই যারা পড়াশুনা করে তাদের দেখলে ভালো লাগে। আমার ইচ্ছে আমার মেয়েটাও পড়াশুনা করুক, যতটা করতে চায়।
— মণি, তুমি বিকেলে মাকে নিয়ে উনাদের টালিগঞ্জে তোমার দাদামশাইয়ের বাড়ি থেকে ঘুরিয়ে আনবে। রত্না আর কাবেরীকেও নিয়ে যেও।
— আচ্ছা বাবা, আমি এখন আসি।
— হ্যাঁ, এসো।
— কিন্তু উকিলবাবু আমাকে তো বিকেলে ফিরতে হবে।
— তা বললে কি হয়, আসা নিজের ইচ্ছায়, যাওয়া পরের ইচ্ছায়।
জমিদারবাবু আপনার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে।
— কী বলছেন উকিলবাবু, প্রার্থনা আমার কাছে?
— হ্যাঁ, আমি এবং আমার স্ত্রী, আমাদের দুজনের ইচ্ছে আপনার মেয়েটা আমাদের ঘরের বৌ হয়ে আসুক, ওরা যেরকম পড়াশুনা করছে করুক, কথা যদি পাকা হয়ে যায়, তবে বিবাহ কিছুদিন পরে হলেও ক্ষতি কী? দুজনে পড়াশুনা শেষ

করুক।
— দেখুন উকিলবাবু, এতো অতি উত্তম প্রস্তাব। আপনারা যদি আমার মেয়েকে বাড়ির বৌ হিসাবে গ্রহণ করেন, সেটা তো আমার মেয়ের সৌভাগ্য। আপনার মেয়ের মতো একটা মেয়েকে বৌ হিসেবে পাওয়া আমাদেরও ভাগ্য।
সেদিনই টালিগঞ্জে মণিশঙ্করের দাদামশাইয়ের বাড়িতে পাকা কথা হয়ে গেল। দাদামশাইয়ের একমাত্র মেয়ে মণিশঙ্করের মা। নাতি-নাতনীদের প্রতি তার অপার স্নেহ। কাবেরীকে নাতবৌ হিসাবে তাঁর খুব পছন্দ। উকিল জয়শঙ্করের ইচ্ছে ছিল কাবেরী তাদের বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ুক, কিন্তু বিনোদবিহারী বললেন পড়াশুনাটা কলেজের হোস্টেলে থেকেই করুক। দাদামশাইও তাঁকে সমর্থন করলেন। কাবেরী ভিক্টোরিয়ার হোস্টেলেই থাকলো। সপ্তাহান্তে কোনওদিন বর্ধমানে, কোনওদিন মানিকতলায় আসে। এক একবার মণিশঙ্কর সঙ্গে করে নিয়ে যায় বর্ধমানে, ফেরার পথে সঙ্গে নিয়ে আসে।
ভূতনাথ এসে বলল— বাবু চা দেব?
জ্যাঠামশাই বললেন— না রে, আর শোন, না ডাকলে এ ঘরে কেউ আসবে না।
ভূতনাথ চলে গেল, জ্যাঠামশাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করলে— ১৯৪৬ সাল। মুসলিম লিগ যে কোনও মূল্যে দেশ ভাগ করে পাকিস্তান আদায়ের জন্য বদ্ধপরিকর। কমিউনিস্ট পার্টি দেশভাগের সমর্থক। নেহরুজী যেভাবেই হোক স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য লালায়িত। বাংলায় তখন সুরাবর্দির শাসন। মুসলমানরা যেভাবে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' বলে হুঙ্কার দিচ্ছে, তাতে হিন্দুরা সর্বদাই আতঙ্কিত। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশনের আগে বাংলার মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলিতে মুসলিম লিগের নেতারা উত্তেজক বক্তৃতা দিয়ে দাঙ্গাকারীদের সংগঠিত করতে লাগল। ভয় ত্যাগ করে দাঙ্গাকারীরা যাতে উজ্জীবিত হয়, সেই জন্য তাদের বলা হল বাংলায় এখন সুরাবর্দির মুসলিম লিগ সরকার। পাকিস্তান আদায়ের জন্য এখন দাঙ্গা, খুন, জখম, নারী ধর্ষণ, লুঠতরাজ যাই করা হোক না কেন তার জন্য কোনও শাস্তি হবে না। বরং পাকিস্তান হাসিল হলে দাঙ্গাকারীদের পুরস্কৃত করা হবে।
তারপর কিছুদিন ধরে বেলগাছিয়া, রাজাবাজার, কলাবাগান বস্তি, ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, ধর্মতলা, পার্কসার্কাস, এন্টালি প্রভৃতি এলাকার মুসলমান গুন্ডাদের নতুন অস্ত্র সংগ্রহ এবং পুরোনো অস্ত্রে শান দিতে দেখা গেছে। বাংলার মুসলিম লিগ সরকারের চাল সংগ্রহের অন্যতম এজেন্ট ইস্পাহানি তার ব্যবসায় ব্যবহৃত লরিগুলি মুসলিম লিগ ভলান্টিয়ারদের ব্যবহারের জন্য দেয়। এসব লরির জন্য কলকাতার মেয়র ওসমান, প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দিরা পেট্রলের ঢালাও কুপন ইস্যু করে, তাছাড়াও এইসব লরিতে মুসলিম লিগের পতাকা লাগিয়ে বৌবাজার ও সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের পেট্রলপাম্প থেকে জোর করে পেট্রল ভরে নেয়।
১৫ আগস্ট সকালে টালিগঞ্জ থেকে খবর এল, মণিশঙ্করের দাদামশাই খুব অসুস্থ। বাবা মণিশঙ্করকে পাঠালেন দাদামশাইয়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয়েছিল দাদামশাইয়ের, ডাক্তার দেখে ওষুধ লিখে দিলেন। সেই ওষুধ সময়মত ঘড়ি ধরে খাওয়াতে হবে। দিদিমা ভরসা পাননি, তাই মণিশঙ্করকে রাতে আসতে দেননি।
এদিকে মুসলমান মহল্লাগুলিতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র মজুদ করা হলো। যাতায়াত এবং লুটপাটের জন্য সরকারি মদতে গাড়ির ব্যবস্থা হলো। কলকাতার গুন্ডবাহিনী ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে নৌকায় করে দাঙ্গাকারীরা এসে গঙ্গার ঘাটে আস্তানা তৈরি করে। তিন সপ্তাহ ধরে প্রস্তুতির পর এলো সেই কালো দিন— ১৬ আগস্ট। মুসলিম লিগের ডাকা 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে দলে দলে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অবাঙালী মুসলিম গুন্ডাবাহিনী এসে মিশে গেল চৌরঙ্গী চিৎপুরে অপেক্ষমাণ ঘাতকবাহিনীর সঙ্গে। ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগ ডেকেছিল হরতাল। সরকারি ছুটি দিয়েছিল সুরাবর্দির সরকার। উদ্দেশ্য মুসলমানরা যাতে নিজ নিজ এলাকায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে পারে। মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির গুন্ডাদের উপর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের হিন্দু নিধনের ভার দেওয়া হলো। রাজাবাজার অঞ্চলের মুসলমানদের ভার দেওয়া হলো মানিকতলা থেকে শিয়ালদহ বৌবাজার কলেজ স্ট্রিট এলাকার হিন্দু সংহারের।
সরকারি ছুটি, কোর্ট নেই, উকিল জয়শঙ্কর মুখার্জি চেম্বারে বসে একটা জটিল কেসের কাগজপত্র দেখছেন। পাশের টেবিলে উমাশঙ্কর, জয়শঙ্কর বললেন— বড় খোকা, তুমি আজ বিকেলে একবার দাদামশাইয়ের কাছ থেকে ঘুরে এসো। আজ তো আবার লিগ বন্ধ ডেকেছে, দেখো যদি গাড়িঘোড়া চলে মাকেও নিয়ে যেও।
— আচ্ছা বাবা।
— দাদামশায়ের শরীর ভালো থাকলে মণিকে চলে আসতে বলো।
ঠাকুরঘর থেকে শাঁখের শব্দ আসছে, মায়ের পূজা শেষ। এমন সময় ছুটতে ছুটতে আসে ভীত সন্ত্রস্ত মালি, বলল—

বাবু, অগুনতি মানুষ, সবার হাতে টাঙ্গি, তলোয়ার। রাজাবাজারের মুসলমান সব। বড় রাস্তার ধারে লাহাবাবুদের বাড়িতে আগুন দিয়েছে। শশীবাবুদের বাড়ি জ্বলছে, হিন্দুদের বেছে বেছে মারছে। কী হবে বাবু?

— কিছু হবে না, তুই গেটে তালা লাগিয়ে ঘরে থাক। আজ আর বাগানের কাজ করতে হবে না।

মালি তালা লাগাতে চেয়েছিল, কিন্তু তার আগেই একদল মানুষ 'নারায়ে তকদির, আল্লা হু আকবর', 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান', 'মালাউনের রক্ত চাই' এসব ধ্বনি দিতে দিতে ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। মালি বাধা দিতে গিয়েছিল। ঘাতকদের একজন তার পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দেয়। আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে মালি।

চিৎকার শুনে জয়শঙ্কর আর উমাশঙ্কর বাইরে বেরিয়ে আসে, তাদের দেখে উন্মত্ত জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের উপর। প্রচণ্ড আক্রোশে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে দুটি মানুষকে। দোতলার এক ঘরে গানের রেওয়াজ করছিল উমাশঙ্করের স্ত্রী উর্মিলা। তানপুরা ছুঁড়ে ফেলে তাকে টেনে হিঁচড়ে লরিতে তোলে গুন্ডারা। অবস্থা কিছুটা আঁচ করতে পেরে নিজের ঘরের দরজায় খিল দিয়েছিল রত্না। গুন্ডারা দরজা ভেঙে তাকেও টেনে নিয়ে লরিতে তোলে। ততক্ষণে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন সুভদ্রা, স্বামী-পুত্রের ছিন্নভিন্ন শরীর দেখে তিনি মুর্ছিত হয়ে পড়েন। তারপর শুরু হয় লুটপাট। বনেদি বাড়ির দামি দামি জিনিসপত্রগুলি নিয়ে তুলল লরিতে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে প্রাণচঞ্চল বাড়িটাকে শ্মশানে পরিণত করে উল্লসিত ঘাতকবাহিনী চলল অন্য শিকারের সন্ধানে। মণিশঙ্কর এসব ঘটনার কিছুই জানে না। সকালে কয়েকবার বের হতে চেয়েছে, কিন্তু তখন দাঙ্গার খবর সারা কলকাতায় ছড়িয়ে গেছে। পথের বিপদ অনুমান করে দাদামশাই আর দিদিমা তাকে বাড়ির বাইরে যেতে দেয়নি।

১৬ আগস্ট সকাল থেকে লালবাজার পুলিশ কন্ট্রোল রুমে বসে সুরাবর্দি, সেরিফ খান, লাল মিয়া, ওসমান গণির মতো মুসলিম লিগের নেতারা পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রেখে দাঙ্গা পরিচালনা করে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় জমে উঠল লাশের পাহাড়। ১৬ আগস্ট ময়দানে মনুমেন্টের নিচে বিশাল মুসলিম সমাবেশ হলো। সেই সমাবেশে বক্তারা এমন উত্তেজক বক্তৃতা দিল যা শুনে সমাবেশ ফেরত জনতা দ্বিগুণ উৎসাহে তাণ্ডব শুরু করল। হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠনের মহোৎসব শুরু হলো। হাজার হাজার যুবতীকে অপহরণ করা হয়েছে, যাদের অনেকেরই শেষপর্যন্ত খোঁজ পাওয়া যায়নি। যতটা পেরেছে হিন্দুদের মূল্যবান জিনিস লুঠ করেছে।

দ্বিতীয় দিনে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলো। কারণ আক্রমণের প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে হিন্দুরাও প্রতিরোধ গড়ে তুলল। পাশে পেল কলকাতায় বসবাসকারী শিখদের। মানিকতলার মোটর পার্টসের ব্যবসায়ী অরোরা পরিবারের সঙ্গে গাঙ্গুলি পরিবারের দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক। এই পরিবারের ছেলে হরপ্রীত মণিশঙ্করের ছেলেবেলার বন্ধু সহপাঠী। ১৭ আগস্ট সকালে অনেক বাধাবিঘ্ন এড়িয়ে সাইকেলে চেপে হরপ্রীত হাজির হলো টালিগঞ্জে মণিশঙ্করের দাদামশায়ের বাড়িতে। এ বাড়িতে মণিশঙ্করের সঙ্গে বহুবার এসেছে হরপ্রীত। সকালে বিধ্বস্ত হরপ্রীতকে দেখে সবাই অবাক। হরপ্রীত বলল— জলদি ঘর চল মণি।

মণিশঙ্কর বলল— কী হয়েছে, ওদিকের খবর কী?

— সব গিয়ে জানতে পারবি, চল।

দাদামশাই বললেন— ওদের বাড়ির সব ঠিক আছে তো? তোমাদের বাড়ি?

— হ্যাঁ দাদাজী, ওইসব ঠিকই আছে।

কথাটা হরপ্রীতকে ঢোক গিলে বলতে হলো। কারণ এই মুহূর্তে সত্য ঘটনাটা বললে এদের সামলানো দায় হবে। রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। এখানে ওখানে পড়ে লাশ। মাঝে মাঝে ছুটে যাচ্ছে দু-একটি পুলিশের গাড়ি। মুসলমান মহল্লাগুলিকে এড়িয়ে অনেকটা ঘুরপথে হরপ্রীত মণিশঙ্করকে নিয়ে পৌছাল মানিকতলায়। বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে প্রথমে নজের আসে মালির ছিন্নভিন্ন লাশ বীভৎস, চোখ দুটি কিসে খুবলে নিয়েছে। আর্তনাদ করে ওঠে মণিশঙ্কর।

— একি এ যে আমাদের মালি দাদা।

— হ্যাঁ, চলো। অন্দর চলো।

ততক্ষণে এসে গেছে হরপ্রীতের পিতাজী আর চাচাজী। ওদের চোখেমুখে উদ্বেগ। হরপ্রীতের পিতাজী মণিশঙ্করের পিঠে হাত রেখে বললেন— ঘাবড়াও মত্ বেটা, আগে আরভি বহোত্ গজব হ্যায়।

বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে দেখল বারান্দায় পাশাপাশি পড়ে আছে বাবা আর দাদার দেহ। আর সামলানো গেল না মণিশঙ্করকে। ঝাঁপিয়ে পড়লো দেহদুটির উপর। আর্তনাদ শুনে বেরিয়ে আসেন মা সুভদ্রা, চুল আলুথালু চোখ দুটি রক্তজবার মতো লাল। বলেন— এই কে রে তোরা, চিৎকার করছিস? ওদের ঘুম ভেঙে যাবে না! চুপ কর, চুপ কর।

মণিশঙ্কর মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে— মা, মাগো এসব কি হলো মা। মা গো—

হরপ্রীতের মা, চাচি এবাড়িতেই ছিল। তারা মাকে ধরে ভিতরে নিয়ে যায়। হরপ্রীতের বাবা চাচারা অল্প সময়ের মধ্যে দেহগুলি সৎকারের ব্যবস্থা করে ফেলেন। মণিশঙ্কর বলে— আমার বোন

আর রত্না, বৌদি ওরা কোথায়?
হরপ্রীতের চাচা বলেন— ওদের খোঁজ আমরা জানি না। শুনেছি ওদের গুন্ডারা তুলে নিয়ে গেছে। দুঃস্বপ্নের সেই দিনটিও কাটল। হরপ্রীতের পরিবার সবসময় কাছে কাছেই ছিল। পরদিন পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক, এলাকায় শিখ আর হিন্দুরা একজোট হয়ে প্রতিরোধে নেমেছে। এবার শুরু হলো বৌদি আর রত্নার খোঁজ। পাড়ার অনেক হিন্দু আর শিখ মিলে সব সম্ভাব্য স্থানে খোঁজ করা হলো। কিন্তু কোথাও ওদের পাওয়া গেল না। মণিশঙ্কর সবাইকে নিয়ে গেল ভিক্টোরিয়া কলেজের হোস্টেলে। কিন্তু ওখানে একটা মেয়েও নেই। কোথায় গেল কাবেরী? হঠাৎ মণিশঙ্করের নজর পড়ল রাস্তার দিকের দোতলার জানলায়। জানালা থেকে চারটি মেয়ের মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে যাতে রাস্তার লোক এই নৃশংস বীভৎসতা প্রত্যক্ষ করতে পারে। মণিশঙ্কর এগিয়ে গেল জানালার দিকে। একি! দ্বিতীয় জন যে কাবেরী।
মণিশঙ্কর চিৎকার করে উঠল— কাবেরী।
বর্ধমান থেকে কাবেরীর বাবা আর বাড়ির লোকজনও ততক্ষণে এসে গেছে। মণিশঙ্করদের বাড়িতে কাউকে না পেয়ে কলেজের হোস্টেলে চলে এসেছে। হরপ্রীত কাবেরীর দেহটা নামাবার ব্যবস্থা করল। দেহে ততক্ষণে পচন ধরে গেছে। একমাত্র মেয়ের মৃতদেহ আঁকড়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন জমিদার বিনোদবিহারী। গাড়ি করে কাবেরীর দেহ বাড়িতে নিয়ে গেলেন জমিদারবাবু। সারা শহর তন্নতন্ন করে খুঁজেও বৌদি আর রত্নার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। একদিন রাজাবাজার দিয়ে যাচ্ছে মণিশঙ্কর আর হরপ্রীত। দাঙ্গার পর থেকে হরপ্রীত সবসময় নিজেদের পারিবারিক পিস্তলটি সঙ্গে রাখে। হঠাৎ মণিশঙ্করের নজরে আসে রাস্তার ধারে মাংসের দোকনে। সেখানে মাংস ঝোলানোর হুকের সঙ্গে ঝুলছে কয়েকটি উলঙ্গ মেয়ের মৃতদেহ। দুজনে এগিয়ে গেল সেদিকে। না অন্য মেয়েদের দেহ। বহুদিন খোঁজ করেও বৌদি আর রত্নার কোনও খোঁজ পায়নি মণিশঙ্কর। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। মা উন্মাদ, টালিগঞ্জের বাড়িতে দাদামশাই দিদিমার কাছে থাকতেন। দেশ ভাগ হলো।
মণিশঙ্কর আবার পড়াশুনা শুরু করলেন। এম-এ পাশ করে কলেজে চাকরি। তারপর অবসর।
গঙ্গা ঝি ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা দিয়ে এসে বলল— দাদাবাবু, আলো জ্বালিয়ে দেব?
মণিশঙ্কর বললেন— না, অন্ধকার থাক। অন্ধকার ভালো লাগছে। ■